কবর পূজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা



মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

কবর পূজার ধ্বংসাত্বক ফিৎনা

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

ঃঃ প্রকাশনায় ঃঃ
আইডিয়া প্রকাশনী

Qabar Pujar Dhansttak Fitna
Written by Muhammad Abdul Alim

৪৪প্রকাশনায় ৪৪
আইডিয়া প্রকাশনী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আশিক ইকবাল,
ময়ুরেশ্বর, বীরভূম,
মোবাইল ৪ +৯১ ৭৫০১৮৭৯৬৬৮
ই-মেইল ৪ www.iqubal@gmail.com

প্রকাশকাল
First Online Published : 28 February 2015
প্রথম অনলাইন সংস্করণ : ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫
Compose and PDF Creater Mohd.Abdul Alim (Auther of this Book)

মূল্য : ৩০/- (ত্রিশ টাকা মাত্র)

Qabar Pujar Dhansttak Fitna. Written by Muhammad Abdul Alim. 1st Edition 28 February 2015 Published By Idea Publication, Mayureswar, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs : 30/- (Thirty Rupise Only)

উৎসর্গ

হযরত ওহাসী (রাঃ) এঁর শানে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎসর্গ করলাম যিনি শাবল দিয়ে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলেমা কাজ্জাবকে দুনিয়া থেকে বিদায় করেছিলেন

সূচীপত্র

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং একমাত্র উপাস্য । তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর উপাসনা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন । যেমন এরশাদ হয়েছে, ‘‘ওয়ামা খালাক্বাল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াঅ্বুদুন’’-অর্থাৎ ‘আমি মানুষ এবং জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার উপাসনা করার জন্য ।’ তিনি তাঁর বান্দাদেরকে প্রার্থনা এবং দুয়া চাওয়ার জন্য কুরআন শরীফে নির্দেশ দিয়েছেন, ‘‘উদ্‌উনী আসতাজিবলাকুম’’- অর্থাৎ আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব । সুতরাং প্রত্যেক দ্বীনদার, পরহেজগার, মোমেন, মুত্তাকী, নিকটবর্তী, দুরবর্তী প্রত্যেকেই তাদের আশা পুরণ এবং প্রয়োজনের জন্য কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিৎ । কেননা তিনি বলেছেন, ‘‘ফাইন্না কারীবুন উজিবুদ্দা, ওয়াতাদ্দায়ি ইযা দায়ানী’’- অর্থাৎ ‘আমি নিকটে, যখন কোন প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করে, আমি তার উত্তর দিই ।’

তাঁর প্রিয় হাবীব তাজদারে মাদীনা আহমদ মুজতবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম, যিনি রাহমাতুল্লিল আ-লামিন, সাইদুল মুরসালীন, সাফিউল মুজনাবীন । যিনি মানব জাতির মুক্তির দিশারী, শান্তির দুত, মানবতার মূর্ত প্রতীক এবং কিয়ামতের দিন কঠিন হাশরের ময়দানে আমাদের মতো নিকৃষ্ট পাপীদের জন্য সুপারিশকারী । যাঁকে উদ্দেশ্য করে এই পৃথিবী সৃষ্টি, সমগ্র ব্রম্ভান্ডও সৃষ্টি করা হয়েছে, আর যাঁকে সৃষ্টি না করলে মহান আল্লাহ পাক নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত প্রকাশ করতেন না ।

সালাম নিবেদন করি সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), সমস্ত ফেরেস্তা (আঃ), সমস্তা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ), সমস্ত তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন (রহঃ), চার মাযাহাবের চার ইমাম (রহঃ) এবং সমস্ত ওলী আওলিয়া-গওস-কুতুব (রহঃ)-এঁর প্রতি ।

সালাম নিবেদন করি, পীরানে পীর বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ)-এঁর প্রতি, খাজা মইনুদ্দীন চিশতী আজমীরী (রহঃ) এঁর প্রতি, শেখ সিরহিন্দী

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) এঁর প্রতি, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এঁর প্রতি, সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) এঁর প্রতি, হাকিমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এঁর প্রতি, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এঁর প্রতি । যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ । এঁরা শির্‌ক বিদ্‌আত ও বদরসমের বিরুদ্ধে এতই কট্টর ছিলেন যে তাঁরা তাঁদের জ্বালাময় লেখনীর মাধ্যমে বিদ্‌আতী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভন্ড-পীর-ফকির-দরবেশদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন ।

আসল কথা হল, যখনই কোন গুমরাহ বাতিল যে রুপ ধারণ করেই হোক ইসলামকে যখন ধ্বংস করার জন্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখনই উলামায়ে ইসলাম নিজেদের দায়িত্ব পালন করতঃ তাদের গোপন ইতিহাস ফাঁস করে দিয়ে সমাজের কাঠগড়ায় তাদের চিত্র উলঙ্গ করে ছেড়েছেন ।

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন এই বই লেখার পিছনে আমার উদ্দেশ্য কি ? উত্তরে একথাই বলব, ইসলাম ধর্ম হল শিরক - বিদ্‌আত ও সবরকমের বদরসম বর্জিত নিষ্কলুষ একত্ববাদী ধর্ম । কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠা বিদ্‌আতী গোষ্ঠী মাযার নির্মাণ করে জিয়ারতের নাম করে যে পুজা - পার্বন করতে আরম্ভ করে দিয়েছে তাতে ইসলাম ধর্মের নিষ্কলুষ একত্ববাদের গলাতে ছুরি চালানো ছাড়া আর কিছুই নয় ।

আমার এই বই লেখার উদ্দেশ্যই হল, কবর সম্পর্কিত চুল চেরা বিশ্লেষণ করে কবর পুজার মূলোটপাটন করা ।

পাঠকদের জানিয়ে রাখি, মানুষ মাত্রেই ভুল হয় । পুরো সৃষ্টি জগতে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কেউ ত্রুটিমুক্ত নয় । তাই এই বইয়ের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া কোন বিচিত্র নয় । তাই পাঠকদের বলি, এই বইয়ের মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে, তাহলে আমাকে জানাবেন, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ।

ইতি-

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
শালজোড়, বীরভূম
দুরালাপনী - +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১
E-Mail :- md.abdulalim1988@gmail.com

কবর জিয়ারত সুন্নাত

শরীয়াতে আম্বিয়া (আঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), বুযুর্গানে দ্বীন (রহঃ) কিংবা মাতা - পিতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনদের কবর জিআরত করা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাত । হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় কবর জিয়ারত করার অনুমতি ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে ছিল না । কিন্তু পরবর্তীকালে কবর জিয়ারত করার অনুমতি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) দেন । মুসলিম শরীফে আছে, ‘‘কুনতু নাহাইতুকুম আন যিয়ারাতিল কুবুরি ফাযুরুহা’’ অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু এখন বলছি, তোমরা কবর জিয়ারত কর ।

মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘‘ফামান আরাদা আঁইয়াযুরাল কুবুরা ফাইন্না তুযাক্কিরুল আখিরা’’ অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি কবর জিয়ারত করতে চায়, তবে সে তা করতে পারে । কেননা কবর যিয়ারত মানুষকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘‘আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে প্রথমে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু পরে আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ কবর জিয়ারতে মন নরম হয়, চোখে পানি আসে এবং পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয় । অতএব তোমরা কবর জিয়ারত কর । কিন্তু তা করতে গিয়ে তোমরা অশ্লীল, গর্হিত ও বাজে কথাবার্তা বল না ।’’ [(মুসনাদে আহমদ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)]

উপরিউক্ত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), বুযুর্গানে দ্বীন (রহঃ) কিংবা মাতা - পিতা প্রভৃতির কবর জিয়ারত করা মোটেই শরীয়াত গর্হিত কাজ নয় বরং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাত কিন্তু বর্তমানে বুযুর্গানে দ্বীনদের কবরকে কেন্দ্র করে দীর্গকাল ধরে যা কিছু করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ বিদ্‌আত - ইসলাম বিরোধী এবং সুস্পষ্ট শির্‌ক ছাড়া আর কিছুই নয় । আর শির্‌ক সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে এরশাদ করেছেন,

‘‘যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে অংশীদার (শির্‌ক) করে, তার উদাহরণ হল এই যে, তাকে যেন আকাশ থেকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হল, অথবা তাকে পথি - মধ্যে কোন জীবজন্তু কিংবা পশুপক্ষী ছোবল মেরে নিয়ে গেল, অথবা দমকা - বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন অন্ধকারময় কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করল ।’’

উল্লিখিত আয়াতটির মধ্যে আল্লাহ তাআলা চারটি কথা জানিয়েছেন,
(১) আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক (অংশীদার) করা ।
(২) আকাশ থেকে নিক্ষেপ করা ।
(৩) পশু - পক্ষীরা ছোবল মেরে নিয়ে যাওয়া ।
(৪) আর ঘুর্ণিবায়ু বা দমকা বায়ু কর্তৃক দুর - দুরান্তে নিয়ে ফেলে দেওয়া ।

(১) আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক বা অংশীদার করার অর্থ হল, যেসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ঠাবলী কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার সাথে সংশ্লিষ্ট, সেই সকল গুণাবলী বা বৈশিষ্টাবলীকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার উপর সংশ্লিষ্ট না করা । যেমন কাউকে জীবিত করা, মৃত্যুদান করা, সন্তান - সন্ততি দান করা, রিযিক দেওয়া, অদৃষ্ট ও গোপন বিষয়ের জ্ঞান থাকা ইত্যাদি । এইসব বৈশিষ্ট ও গুণাবলী একমাত্র আল্লাহ তাআলার সত্তার সাথেই সংশ্লিষ্ট । কাজেই আল্লাহ ছাড়া অপর কোন সত্তার দ্বারা এসব কাজ হতে পারে এরকম বিশ্বাস বা ধারণা পোষণ করাই শির্ক ।

(২) আকাশ থেকে নিক্ষেপ করার অর্থ হল, তওহীদ বা একত্ববাদের আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়া । বান্দা যখন আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থাপন করে তখন তার মধ্যে আর তওহীদ বা একত্ববাদ অবশিষ্ট থাকে না । সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বীন ও তওহীদ পরিত্যাগ করেছে সে জীবনের সম্মান ও মহত্ব সবকিছু চুলোয় জ্বালিয়ে দিয়েছে । এই কথাটির দ্বারাই আল কুরআনের ভাষায় আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়া বুঝিয়েছে ।

(৩) পশু পক্ষীরা ছোবল মেরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হল, যারা শির্ক করে তাদেরকে শয়তান ছোবল মেরে নিয়ে যাবার জন্য আকাশে উড়ে বেড়াতে থাকে । যেমন, চিল, কাক, বাজপাখী শিকার ধরার জন্য উড়ে বেড়ায় তেমনি শয়তানও মুশরিকদেরকে ছোবল মেরে নিয়ে যাবার জন্য সুযোগের অন্বেষণে থাকে । এখানে মুশরিকগণকে পক্ষী কর্তৃক ছোবল মেরে নিয়ে যাবার সাথে তুলনা করা হয়েছে । হয়েছে । অর্থাৎ পক্ষী যেমন শিকারকে নিজের আয়ত্বাধীন করে ফেলে তেমনি, শয়তানও মুশরিকগণকে নিজের আয়ত্বাধীন করে ফেলে ।

(৪) আর ঘুর্ণিবায়ু বা দমকা বায়ু কর্তৃক দুর - দুরান্তে নিয়ে ফেলে দেওয়ার অর্থ হল, মানুষের নফসের খায়েশ বা প্রবৃত্তির অনুগত হওয়া । প্রবৃত্তির অনুকরণের ফলেই অসংখ্য মুনাফিক ধ্বংসও বরবাদ হয়ে গেছে । তারা প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে শির্ক না করলেও গোপনে শির্ক করেছে । সুতরাং কুরআন শরীফে দমকা হাওয়া বা

ঘুর্ণিবায়ুর দ্বারা নফসের খায়েশের অনুকরণ বা প্রবৃত্তি চাহিদার অনুকরণের কথাই বুঝিয়েছে ।

বর্তমানে বুযুর্গানে দ্বীনদের কবরে জিয়ারতের নাম করে যে শির্ক বিদ্আতের তান্ডব চলে তা কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা ছাড়া আর কিছুই নয় । যেমন - বুযুর্গানে দ্বীনদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখে উরুশ ও মেলা হয়, সেখানে উপস্থিত হওয়াকে ফরজ ইবাদতের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে । মানুষেরা পার্থিব সমস্যার সমাধান ও বিপদ আপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্যই সেখানে উপস্থিত হয় । আর কবরের সামনে এমনভাবে বিনয় ও নম্রতার সাথে কাকুতি - মিনতি করতে থাকে যে এমনিভাবে কাকুতি - মিনতি মসজিদের গিয়ে মহান আল্লাহ, রব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড়িয়ে কখনো করে না ।

বুযুর্গানে দ্বীনদের আত্মাকে এমনভাবে ভয় করে, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে তেমন ভয় করেনা । বুযুর্গানের দ্বীনদের নাম নিয়ে যেভাবে ডাকতে থাকে এবং তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বস্তু পাওয়ার জন্য দোয়া করতে থাকে, তাদের নিকট রিযিক ও সন্তান - সন্ততি চেয়ে থাকে দুয়ার সময় আল্লাহর কাছেও সেরকম চায় না । আর খুব মূল্যবান গিলাফ দ্বারা কবরকে সাজিয়ে তোলে, সুগন্ধিছ লাগিয়ে দেয়, চতুর্দিকে লোবান ও আগরবাতি জ্বালিয়ে স্থানটিকে সুগন্ধময় ও মোহনীয় করে তোলে । তারা এরকম অনর্থক অপব্যয় দ্বারা কবরবাসীদের আত্মার খুশি কামনা করে ও নৈকট্য লাভের আশাও পোষন করে থাকে । এককথাই হিন্দু ও মুশরিকগণ যেরকম নিজেদের প্রতিমা ও মুর্ত্তির সাথে ব্যাবহার করে থাকে, সেইরুপ আমাদের মুসলিম সমাজে কবর পুজারীরা বুযুর্গানদের কবর নিয়ে এরম ধরণের শির্কী কার্যকলাপ করতে থাকে, যার সমর্থন শরীয়াতের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না । [(আল বালাগুল মুবীন, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)]

কবর পাকা করার বিরুদ্ধে সহীহ হাদীস

আজকাল যেভাবে বুযুর্গানে দ্বীনদের কবরকে পাকা করে তার উপর মাসজিদ, গুব্বা বা কোব্বা ইত্যাদি নির্মাণ করা হয় তা শরীয়াতের দৃষ্টিতে নাজায়েজ । যেমন হাদীস শরীফে আছে,

(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "লাআনা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যায়িরাতিক কুবুরি ওয়াল মুত্তাখিযিনা আলাইহাল মাসাজিদা

ওয়াস্‌সাররজা’’ অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, কবর জিয়ারতকারী মেয়েলোকদের উপর এবং তাদের উপরও যারা (কবরে) মসজিদ, গুম্বদ বা কোব্বা ইত্যাদি নির্মাণ করে । (মুসনাদে আহমদ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল)

(২) হযরত আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ‘‘লাআনান্নাহুল ইয়াহুদা ওয়ান্নাসারা আত্তাখুজু কুবুরা আম্বিয়াইহিম মাসাজিদা’’ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন ইহুদী ও নাসারাদের (খ্রীষ্টান) ওপর এ জন্য যে, তারা তাদের নবী রসুলদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে । (বুখারী শরীফ)

(৩) হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ‘‘আঁই ইয়ুস্‌সাসাল কুবুরু ওয়া আন ইয়াকতুবা আলাইহা ওয়া আন তাওতাআ’’ অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কবর পাকা করতে, কবর গাত্রে লিখতে এবং কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন । (তিরমিযী শরীফ)

(৪) হযরত জাবির (রাঃ) আরও বর্ণনা করেছেন, ‘‘নাহা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আঁইয়ুস্‌সাসাল কুবুরি ওয়া আঁইয়ুবনা আলাইহি ওয়া আঁইআকউদা আলাইহি ওয়া আঁইয়ুকতুবু আলাইহি’’ অর্থাৎ কবরকে পাকা পোক্ত করে বানাতে, তার উপর কোনরুপ নির্মাণ কাজ করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর কিছু লিখতে নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট নিষেধ করেছেন । (মুসলিম শরীফ)

(৫) নবী করীম (সাঃ) দুয়া করেছেন এই বলে, ‘‘আল্লাহুম্ম লা তাজআলু কাবরি ওয়া শানান ইয়ুঅ্বাদু ইসতাদ্দা গাজাবুল্লাহি আলা মওমিল ইত্তাখাজু কুবুরা আম্বিয়াইহিম মাসাজিদা’’ অর্থাৎ হে আল্লাহ ! তুমি আমার কবরকে কোন পূজ্য-মূর্তী বানিয়ে দিও না । বস্তুত যে জাতি তাদের নবী রসুলদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে, তাদের উপর আল্লাহর গজব তীব্র হয়ে উঠেছে । (বুখারী শরীফ)

(৬) হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ‘‘আ লা ইন্না মান কানা কাবলাকুম কানুস ইয়াত্তখিজু কুবুরা আম্বিয়াইহিম ওয়া সালিহিইহিম মাসাজিদা আ আ লা ফালা তাত্তাখিজু ওয়াল কুবুরা মাসাজিদা ফা ইন্নি আনহা কুম আন যালিকা’’ অর্থাৎ সাবধান হও, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নবী রসুল ও নেক লোকের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছিল । তোমরা কিন্তু সাবধান হবে, তোমরা

কখনো কবরকে মসজিদ বানাবে না । আমি এ থেকে তোমাদের স্পষ্ট নিষেধ করছি । (মুসলিম শরীফ)

(৭) কবরকে কেন্দ্র করে যে উরুষ ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় তা ইসলামের নিষিদ্ধ । হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ‘‘সামিঅ্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়াকুলু ঃ লা তাজআলু বুয়ুতাকুম বির কুবুরান ওয়ালা তাজআলু কাবারু ইদান ওয়া সাল্লু আলাইয়া ফা ইন্না সালাতাকুম তাবলুগুনি হাইসু কুনতুম’’ অর্থাৎ রাসুলে কারীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করো না (অর্থাৎ অন্তত নফল নামাজ নিজেদের ঘরেই পড়বে) । তোমরা আমার কবর-কেন্দ্রে মেলা বসাবে না, তোমরা আমার প্রতি দরুদ পাঠাবে, যেখানে থেকেই তোমরা দরুদ পাঠাও না কেন, তা অবশ্যই আমার নিকটে পৌছবে । (নাসাই শরীফ, আবু দাউদ শরীফ)

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় যে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন, আমার কবর কেন্দ্রে মেলা বসাবে না, আর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মতো মহান ব্যক্তির কবরে মেলা বসানো যদি নিষিদ্ধ হয় তাহলে বুযুর্গানে দ্বীনদের কবরে মেলা বসানোর ফতোয়া কবর পুজারীরা লাভ করলেন কোথা থেকে ? তাহলে তাঁদের কাছে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কবর মুবারকের চাইতে কি বুযুর্গানের দ্বীনদের কবরের গুরুত্ব অনেক বেশী ? (নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক)

(৮) হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ‘‘আল্‌লা তাদ্‌আ তিমশানাল ইল্লা লামাস্‌তাহু ওয়ালা কাবরান মুসার্‌রাফান ইল্লা সাওয়াইতাহু’’ অর্থাৎ সব জীব জন্তুর ছবি ও আকৃতি চুরমার করে দেবে এবং সব উচ্চ ও উন্নত কবর ভেঙে মাটির সাথে সমান ও একাকার করে বেদে । - এ থেকে এমন কোন প্রতিকৃতি ও কোনো কবর রক্ষা না পায় । (মুসলিম শরীফ)

(৯) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘‘লাআনাল্লাহু যাওয়ারাতিল কুবুরিল মুত্তাখিজিনা আলাইহিল সির্‌রাজা’’ অর্থাৎ কবর জিয়ারতকারী মেয়েলোক এবং তার উপর যারা বাতি জ্বালায় তাদের উপর আল্লাহ তাআলা অভিশাপ করেছেন । (বুখারী শরীফ)

(১০) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘‘উলাইকা ইযা মাতা মিনহুমুর রাজুলুসসালিহু বানাও আলা কাবরিহি মাসজিদান সুম্মা সাওয়ারুহু ফিহি

তিলকাসসুরুতা উলাইকা সাবরুল খালকি ইনদাল্লাহি'' অর্থাৎ এসব ছবি ও প্রকৃতির ইতিহাস হল এই যে, তাদের মধ্যে থেকে কোন নেককার (পীর বা ওলী আল্লাহ বলে কথিত) ব্যক্তি মারা গাছেন, তখন তার কবরের উপর তারা মসজিদ নির্মাণ করেছে। অতঃপর তার মধ্যে এসব ছবি ও প্রতিকৃতি সংস্থাপিত করেছে। আসলে তারাই হল আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম লোক। (বুখারী শরীফ)

(১১) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ''ইসতাদ্দা গাজাবুল্লাহি আলা কওমিন ইত্তাখাজু কুবুরা আম্বিয়াইহিম মাসাজিদা'' অর্থাৎ সেই লোকদের উপর আল্লাহর গজব অত্যন্ত তীব্র ও প্রচন্ড হয়ে এসেছে যারা তাদের নবী রাসুলগণের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছে। (বুখারী শরীফ)

১২) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কবর পাকা পোক্ত ও শক্ত বানাতে, তার উপর কোনরুপ নির্মাণ কাজ করতে, তার উপর বসতে এবং তার কোন কিছু লিখতে নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট নিষেধ করেছেন। (মুসলিম শরীফ)

১৩) আল্লাহর রাসুল (সাঃ) দুয়া করেছেন, হে আল্লাহ ! তুমি আমার কবরকে কোনো পূজ্যমূর্তি বানিয়ে দিও না। বস্তুত যে জাতি তাদের নবী রাসুলদেরকে কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে, তাদের উপর আল্লাহর গজব তীব্র হয়ে উঠেছে। (মুসলিম শরীফ)

১৪) নবী (সাঃ) মুসলমানদের লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন, সাবধান হও, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নবী রাসুল ও নেক লোকের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছিল। তোমরা কিন্তু সাবধান হবে, তোমরা কখনও কবরকে মসজিদ বানাবে না। আমি এ থেকে স্পষ্ট নিষেধ করছি। (মুসলিম শরীফ)

১৫) কবররের উপর কিছু লিখতে নিষেধ করা হয়েছে যে সব হাদীসে, তার সক কয়টিরই সনদ বিলকুল সহীহ। কিন্তু তদাতনুযায়ী আমল করা হচ্ছে না। কেননা সর্বত্র মুসলিম ইমামদের কবরের উপর কিছু না কিছু লেখা থাকতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে লোকেদের কাছ থেকে এসব শিখেছে (ও জায়েয বলে মনে হয়েছে)। (মুসতাদরাক হাকীম, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৩৮০)

সুতরাং উপরিউক্ত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় কবর পাকা করা, কবরের উপর গুম্বদ নির্মাণ করা, কবরে চেরাগ - আগরবাতি জ্বালানো সম্পূর্ণভাবে ইসলাম

ধর্মের পরিপন্থী কাজ । আর এই হাদীসকে সামনে রেখেই ভারতবর্ষের হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি (রহঃ) লিখেছেন, "নবী রসুলদের কবরকে উন্নত করা, তার উপর গম্বুজ নির্মাণ, উরুষ অনুষ্ঠান করা, চেরাগ বাতি জ্বালানো সম্পূর্ণ বিদ্আত । এর মাঝে কতকগুলো বিদ্আত মকরুহ (তাহরিমী) । নবী করীম (সাঃ) কবরে বাতি জ্বালানো ও সিজদা করার উপর লা'নত করেছেন । বলেছেন, না আমার কবরের উপর মেলা বসাবে না, না তার উপর মসজিদ বানাবে, না এরুপ কোন মসজিদে নামায পড়বে । না কোনো নির্দিষ্ট তারিখে সেখানে একত্রিত হবে । নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) - কে পাঠিয়েছিলেন এ নির্দেশ দিয়ে যে, উঁচু কবর ভেঙে সমান করে দেবে এবং প্রতিকৃতি যেখানেই পাবে, মুছে ফেলবে ।

গাইরুল্লাহর থানে মনত করা চারাম

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েজ কাজ । আরবী ভাষায় মানতলে 'নযর' বলা হয় । ইসলামে একমাত্র আল্লাহর নামেই মানত করা জায়েয । অন্য কারো নামে মানত করা জায়েয নয় । তফসিরে আবুস সউদে লেখা আছে ঃ "মানত হচ্ছে মনকে কোন কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা এবং তাকে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পন্ন করা ।"

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রহঃ) লিখেছেন, "আমাদের মতের লোকেরা বলেছেন 'ইবাদত কিংবা দান খয়রাতের কিছু নিজের উপর অতিরিক্তভাবে ওয়াজীব করে নেওয়াকেই মানত বলা হয় ।"

কুরআন শরীফে সুরা আল ইমরানে বলা হয়েছে, "ইমরান - স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহ ! আমার গর্ভে সন্তান রয়েছে তা আমি তোমারই জন্য মানত করলাম, তাকে দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখবে, অতএব তুমি আমার এ মানত কবুল কর ।"

আল্লাহ তাআলা নিজেই মরিয়মকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "ফাকুলু ইন্নী নাযারতু লি রাহমানি সাওমান" অর্থাৎ অতএব তুমি বল, আমি আল্লাহর জন্য রোজা মানত করলাম ।

সুতরাং কুরআন শরীফের উপরিুক্ত আয়াত অনুযায়ী কেবলমাত্র আল্লাহর নামেই মানত করা জায়েজ । আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা জায়েয নয় ।

এ'তো গেল মানত সম্পর্কে কুরআন শরীফের কথা, এখন আমরা দেখব হাদীস শরীফে মানত সম্পর্কে কি বলা হয়েছে ।

১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে মানত দ্বারা আল্লাহর সন্তোষ নাভ করতে চাওয়া হয়নি, তা মূলতঃ মানতই নয় ।" (আবু দাউদ শরীফ)

২) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "মানত সাধারণত দু'প্রকারের হয় । যে মানত আল্লাহর আনুগত্যের কোন কাজের হবে, তা আল্লাহর জন্য বটে এবং তাই পুরা করতে হবে । আর যে মানত আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের মাধ্যমে হবে, তা হবে শয়তানের উদ্দেশ্যে । তা পুরা করার দায়িত্য নেই । কর্তব্যও নয় ।" (নাসাই শরীফ)

৩) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, "তোমরা কি লোকদেরকে মানত মানা' থেকে নিষেধ করনা ? অথচ নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, মানত মানা'য় না কিছু আসে, না কিছু যায় । বরং এতে শুধু এতটুকু কাজ হয়, এর ফলে কৃপণের কিছু ধন খরচ হয়ে যায় মাত্র ।" (বুখারী শরীফ)

৪) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "লা ইয়া'তী ইবনুআদামাননায্‌রি বিশাইঈনন লাম ইয়াকুনা কুদ্দিরালাহু ওয়ালাকিন্নাহু ইয়ুলহিন্নয্‌রু ইলালকাদ্‌রি ক্বাদ্‌ কুদ্দিরালাহু ফাসাইতাখরিখুল্লাহু বিহি মিনাল বাখিলি ইয়ু'তিনি আলাইহি মা লাম ইয়াজুন ইয়ু'তিনি আলাইহি মিন কাবলু ।"

অর্থাৎ মানত আদম-সন্তানকে কোন উপকারই দেয়না । দেয় শুধু তাই, যা তার তকদীরে লিখিত হয়েছে । স্বয়ং মানত মানুষকে তার তকদীরের দিকেই নিয়ে যায় । অতঃপর কৃপণ ব্যক্তির হাত থেকে আল্লাহ কিছু খরচ করান । তবে ফলে সে আমাকে (আল্লাহকে) এমন কিছু দেয়, যা এর পূর্বে সে কখনোই দেয়নি । (বুখারী শরীফ)

৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে মানত মানা' থেকে নিষেধ করেছিলেন । বলেছিলেন, মানত কোন কিছুই ফিরাতে পারে না, তাতে শুধু কৃপণের কিছু অর্থ ব্যয় হয় মাত্র । (মুসলিম শরীফ)

৬) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "লা তানযিরু ফা ইন্নান্নাযরি লা ইয়ুগনী মিনাল কাদরি শাইয়ান ।" অর্থাৎ তোমরা মানত মানবে না । কেননা এই মানত একবিন্দু তকদীর বদলাতে বা ফিরাতে পারে না । (মুসলিম শরীফ)

সুতরাং উপরিউক্ত হাদীস অনুযায়ী আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা হারাম, তা যে কোন ওলীর নামে হোক বা যে কোন নবীর নামে হোক ।

বিখ্যাত আলেম ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-কাহলানী আস সানয়ানী (রহঃ) বলেছেন, "মানত মানাকে হারাম বলার কথা তো হাদীস থেকেই প্রমাণিত । এ হারাম হওয়ার কথা আরো শক্ত হয় এজন্য যে, মানত মানা থেকে নিষেধ করতে গিয়ে তার কারণ দর্শানো হয়েছে এই যে, এতে কোনোই কল্যান আসে না । তাতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তা তো অযথা বিনষ্ট করা হয় । আর অর্থ নিনষ্ট করা হারাম । অতএব ধন মাল দেওয়ার মানত মানাও হারাম ।"

আল্লামা কাজী ইয়াজ (রহঃ) বলেছেন, "মানত তকদীরের উপর জয়ী হতে চায় । আর জাহেল লোকেরা মনে করে যে, মানত করলে তকদীর ফিরে যাবে ।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেছেন, "ইয়াকরাহুননাযরু ফিত্তাআতি ওয়াল মাআ্সিহ" অর্থাৎ মানত - তা আল্লাহর হুকুম বরদারীরই হোক কি নাফরমানীর - উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য মাকরুহ হবে ।

হানাফী মাজহাবের ফিকাহের কিতাবে লেখা আছে, "কেউ যদি বলে, 'অমুক দিন আল্লাহর নামে কিছু দান করা আমার উপর ওয়াজীব' কিংবা বলে, 'অমুক স্থানের মিসকিনদের জন্য কিছু সদকা দেওয়া ওয়াজীব' তাহলে দিন ও স্থানের কয়েদ পালন করা জরুরী নয় ।"

আল্লাহ ভিন্ন অন্য নামে উৎসর্গকৃত জিনিস হারাম

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআনে করীমের মধ্যে বলেছেন, "হুররিমাত আলাইকুম মাইতাতু ওয়াদ্দামুন ওয়া লাহমুল খিন্যির ওয়ামা উহিল্লা বিহি লি গাইরিল্লা-হি বিহি উয়াল মুন খানিকাতু ওয়াল মাউকু যাতু ওয়াল মুতা রাদিয়াতু ওয়ান্নাতি হাতু ওয়ামা আকালাস্ সাবুউ ইল্লা মা যাক্কাইতুম ওয়ামা যুবিহা আলাল নুসুবী ওয়া আন তাসতাকসিমু বিল আযলাম ।" (কুরআন শরীফ, ৫ঃ৩)

অর্থাৎ তোমাদের জন্য হরাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গিত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পড়ার ফলে মারা যায়, যা শিংয়ে আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা জবাই করেছ । যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে জবাই করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বিতরণ করা হয় ।

কুরআন শরীফে উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহপাক আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত জন্তুর মাংস খাওয়াকে এবং শূকরের মাংস খাওয়াকে পাশাপাশি হারাম বলে ঘোষণা করেছেন । সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত জন্তু খাওয়া শূকরের মাংস খাওয়ার সমতুল্য ।

আজকাল বুযুর্গানে দ্বীনদের কবরে বিভিন্ন জীব - জন্তু উৎসর্গ করা হয় তা শরীয়াতের দৃষ্টিতে নাপাক ও হারাম । যেমন কোনোও গরুকে বলা হয় এটা অমুক বাবার গরু, এটা অমুক পীরের ছাগল ইত্যাদি । কুরআন শরীফে একথা বলা নেই যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে জবাই করা জীব হারাম হয়ে যাবে শুধুমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে নামাঙ্কিত করলেই তা হারাম হয়ে যাবে । যদি অন্য কোন পশু হাঁস হোক, মুরগী হোক, ছাগল হোক, ভেড়া হোক বা অন্য যে কোনই পশু হোক সৃষ্টির কোনোও নামে অর্থাৎ নবী, ওলী, পীর বা যে কোন বুযুর্গানে দ্বীনদের নামাঙ্কিত করলেই কুরআন শরীফের ফতোয়া অনুযায়ী উক্ত পশুর মাংস খাওয়া হারাম হয়ে যাবে ।

একবার একজন মহিলা গুড়িয়ার (খেলনার) বিবাহে একটি জন্তু জবাই করেছিলেন, তখন হযরত হাসান বসরী (রহঃ) ফতোয়া দিয়েছিলেন, এই জন্তুর মাংস খাওয়া উচিৎ নয় এই জন্য যে এই জন্তু এক ছবির জন্য জবাই করা হয়েছে ।

এখানে উল্লেখ্য বিষয় যে সেই মহিলা তো আল্লাহর মান উচ্চারণ জন্তুটি জবাই করেছিলেন তবুও হযরত হাসান বসরী (রহঃ) সেই জন্তুটির মাংস খাওয়াকে হারাম বলে ফতোয়া দিলেন কেন ? তার কারণ জন্তুটিকে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে জবাই করা হলেও অন্যের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছিল, সেজন্য হাসান বসরী (রহঃ) তার মাংস খাওয়াকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন । তাহলে আজকাল যেভাবে বিভিন্ন বুযুর্গানে দ্বীনদের নামে নামাঙ্কিত করা জীব-জন্তুর মাংস খাওয়া হারাম হবে না কেন ?

সিজদাহ একমাত্র আল্লাহর জন্য

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন আল্লাহর রসুল (সাঃ) মুহাজিরীন ও আনসারদের একটি সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন । সেখানে একটি উঁট এসে হুযুর (সাঃ) কে সিজদা করল । সাহাবা হযরতগণ রাসুল (সাঃ) কে বললেন, পশু ও বৃক্ষ আপনাকে সিজদা করছে, তাদের থেকে আমাদের অধিকার অনেক বেশী । সুতরাং আমরা আপনাকে সিজদা করি । নবী (সাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের প্রভূর ইবাদত কর এবং তোমাদের ভাইকে (নবীজীকে) সম্মান কর । (মুসনাদে আহমদ)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত কায়েস বিন সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন - তিনি বলেছেন, ‘হীরা’ শহরে গিয়ে দেখলাম সেখানকার মানুষেরা তাদের রাজাকে সিজদা করছে । আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) সিজদা পাওয়ার অধিক অধীকারী । অতপর আমি নবী (সাঃ) এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি ‘হীরা’ শহরে মানুষদের রাজাকে সিজদা করতে দেখলাম, এ ব্যাপারে আপনিই যোগ্য অধিকারী । সুতরাং আমরা আপনাকে সিজদা করি । নবী (সাঃ) বললেন, প্রথমে তুমি বল যে আমার কবরে গিয়ে সিজদা করবে কিনা ? আমি বললাম, না । তিনি (সাঃ) বললেন, এ কাজটিও কর না । (আবু দাউদ শরীফ)

এই হাদীস থেকে পরিস্কার প্রতিপন্ন হয় এই হাদীসের রাবী হযরত কায়েস বিন সায়াদ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) এর কবরে সিজদা করাকে হারাম বলে মনে

করেছেন এবং নবী করীম (সাঃ) তাঁকে সমর্থন করেছেন । আর নবী করীম (সাঃ) এর কবর মুবারককে সিজদা করা যদি হারাম হয় তাহলে বুযুর্গানে দ্বীনদের কবরকে সিজদা করা কিভাবে জায়েয হতে পারে ? তবে কি কবর পুজারীদের কাছে নবী করীম (সাঃ) এর চাইতে বুযুর্গানে দ্বীনদের কবরের গুরুত্ব বেশী ? (নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক)

কবর পুজারীরা বলেন, আমরা ত বুযুর্গানে দ্বীনদের উপাসনা করার জন্য তা'বুদী (ইবাদতী) সিজদা করিনা সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাজিমী (সম্মানীয়) সিজদা করি । মূর্খদের বোঝাবে কে সাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে তাজিমী সিজদা করার অনুমতিই তো চেয়েছিলেন । তাঁরা নবী (সাঃ) কে তা'বুদী (ইবাদতী) সিজদা করতে চাননি ।

বেরেলী মাযহাবের বিখ্যাত মাসআলার কিতাব ‘‘কানুনে শরীয়াত’এ লেখা আছে, ‘‘তা’বুদী (ইবাদতী) সিজদা কুফ্‌রী এবং তাজিমী (সম্মানীয়) সিজদা হারাম’’ তাহলে কবর পুজারীরা বুযুর্গানে দ্বীনদের কবরে সিজদা করার ফতোয়া লাভ করলেন কোথা থেকে ?

কবর পূজারীদের যুক্তি খন্ডন

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, ‘‘কবর - পূজারকগণ নিজেদের সমর্থনে যে সকল মিথ্যা কেচ্ছা কাহিনী ও রুপকথা বলে মানুষকে গোমরাহ করে তার ভিতর একটি হল এই যে, তারা বলে অমুক ব্যক্তি কি কঠিন বিপদ ও হয়রানী-পেরেশানীর মধ্যে নিপতিত ছিল । সে যখন অমুক বুযুর্গের কবরের নিকট গিয়ে প্রার্থনা করল, তখন তার বিপদ-আপদ হয়রানী-পেরেশানী দুর হয়ে সে মুক্তি পেয়ে গেল । আর অমুক ব্যক্তির উপর আসমানী বালা নাযিল হলে সে ঐ কবরবাসীকে ডাকলে পরে কবরবাসী তার বালা দুর করে দিল । আর অমুক ব্যক্তি নিজের কাজ ও হাজত সম্পর্কে কবরের নিকট গিয়ে দোয়া করল তার হাজত পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল । যেমন বিগত বৎসর টেনডর ওয়ালা ইয়ারের কাছে একটি কবর আবিস্কৃত হল সেখানে বিকলাঙ্গ, আতুর খোড়া লোকেরা আরোগ্য লাভ করার জন্য যেত ।’’

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) আরও লিখেছেন, ‘‘এই হতভাগাদের বুদ্ধি জ্ঞানের উপর আবার পড়ে গেছে এবং শয়তান তাদেরকে তার

জালে এমনভাবে জড়িয়ে বন্দি করে নিয়েছে যে মসজিদে এসে আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়ার ক্ষমতা তাদের কারো হয় না । ঘরের দরজার কাছে মসজিদ থাকা সত্যেও সেখানে গিয়ে দোয়া করার কষ্টটুকু স্বীকার করতে পারে না; কিন্তু মাইলের পর মাইল হেঁটে কবরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে কুণ্ঠাবোধ করেনা । তাদের প্রভূ হল কবরে সমাহিতা ব্যক্তি এবং হাদী ও পথ প্রদর্শক হল কবরের খাদেম ও পূজারকগণ । আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসুলের সাথে তাদের কি সম্পর্ক বলতে পার ? কবরের এই সকল খাদেম ও চেলা - চামুন্ডাগণের কাছ থেকে এই ধরণের বহু আশ্চর্য কাহিনীও ঘটানো যায়, যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয় । মোটকথা আল্লাহ তাআলার মখলুকগণের মধ্যে এই কবর পূজারকগণ হল মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ ও প্রতারণার দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ । তারা জীবিত মৃত সকলের বেলায় মিথ্যার বেসাতি করে থাকে ।” (আল বালাগুল মুবীন, পৃষ্ঠা ৩৮ - ৩৯)

কবর পূজারীরা একথা বলে থাকেন যে তাঁরা পরকালবাসী বুযুর্গানের দ্বীনদের মা’বুদ (উপাস্য) বলে মনে করেন না । আল্লাহর সৃষ্ট মখলুক বলেই মনে করেন । আর তাঁদের কবরে যাওয়ার উদ্দেশ্য হল আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা ।

কবর পূজারীদের এই কথা শরীয়াতের কোন দলীল নয় । আরবের কাফের কোরাইশরাও বলতেন যে তাঁরা লাত, ওজ্জা, মানাত, হাবল প্রভৃতি দেব দেবীকে আল্লাহর সৃষ্ট মখলুক বলেই মনে করেন । তাদের মন্দিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যই হল আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা । কবর পূজারীদের মতো তাঁরাও মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনকেই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা বলেই মনে করতেন ।

অনেক কবর পূজারী একথাও বলে থাকেন যে তাঁরা বুযুর্গানের দ্বীনদের সাথে এজন্য যোগাযোগ রাখেন যে তাঁরা কিয়ামাতের ময়দানে তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন । কবর পূজারীদের এই যুক্তিও নির্জলা মিথ্যা । কারণ, কোন ব্যক্তির আমল যদি খারপ থাকে বা শির্ক বিদআতের মধ্যে ডুবে থাকে তাহলে বুযুর্গানের দ্বীনরা তো দুরের কথা এক্ষেত্রে নবী করীম (সাঃ) এরও সুপারীশ কার্যকারী হবে না । কেননা হাদীস শরীফে উল্লিখিত আছে, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, কবীরাহ গুনাহকারীদের জন্য আমাকে অবশ্যই সুপারীশ করতে হবে । হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহর কাছে প্রত্যেক নবীর এক একটি দুয়া কবুল হবে । প্রত্যেকেই তাদের সেই বিশেষ দুয়া আল্লাহর কাছে পেশ করবেন । আর আমি সেই দুয়া আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য রেখে দিয়েছি । তার সাহায্যেই আমি

আমার উম্মতগণকে শাফায়াত করবো। যে লোক কখনো শির্ক করেনি, আমার দুয়া তার জন্য ইনশাল্লাহ কবুল হবে। [গুনিয়াতুত্ ত্বালেবীন, হযরত আব্দুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ)]

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এখানে বলেছেন, "যে লোক কখনো শির্ক করেনি, আমার দুয়া তার জন্য ইনশাল্লাহ কবুল হবে।" সুতরাং যারা শির্ক করবে তাদের জন্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুপারিশ কিয়ামতের ময়দানে কবুল করা হবে না। তাহলে বুযুর্গানে দ্বীনদের সুপারিশ কিভাবে কবুল করা হতে পারে? আমরা জানি ভারতবর্ষের যতগুলো বুযুর্গানের দ্বীনদের কবর আছে অধিকাংশ কবরই হল শির্ক বিদ্আতের আখড়া।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন - "তিনি বলেন, যখন পবিত্র কুরআনের আয়াত, 'তোমরা নিকট আত্মীয়দেরকে সাবধান করে দাও' অবতীর্ণ হল, তখন আল্লাহর রসুল (সাঃ) স্বীয় আত্মীয় পরিজনদের ডেকে বললেন - হে কা'ব ইবনে লুওয়াই, জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও, আমি আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদের মুক্তি দিতে পারব না। হে মুর্‌রাহা বিন কা'বের বংশধর! জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও আমি আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারব না। হে আবদে শামস্- এর বংশধর! জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও আমি আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারব না। হে আবদে মানাফের বংশধর! জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও আমি আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারব না। হে হাশিম এর বংশধর! জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও আমি আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারব না। হে আব্দুল মোত্তালেবের বংশধর! জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও আমি আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারব না। হে ফাতিমা! আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজের জীবনকে বাঁচাও, আমার সম্পদ তোমার ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ কর, কেননা আল্লাহর শাস্তি থেকে অব্যহতির জন্য কোনও কাজে আসব না।" (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর অমর বীর মুজাহিদ, শির্ক বিদ্আতের মুখোশ মুলোৎপাটনকারী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভন্ড-পীর-ফকীর-দরবেশদের মুখোশ উন্মোচনকারী, কবরপূজারীদের মুন্ডপাতকারী কওম ও মিল্লাতের গৌরব হযরত মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, "যে ব্যক্তি

কোনোও বুযুর্গের আত্মীয় সে ব্যক্তি উক্ত বুযুর্গের সাহায্য ও সহায়তার উপর নির্ভর করে নিজে গর্বিত ও নির্ভিক হয়ে পড়ে । এই কারণেই আল্লাহপাক স্বীয় পয়গম্বরকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি যেন তাঁর আত্মীয় পরিজনবর্গকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেন । তিনিও এক এক করে স্বীয় স্নেহের কন্যা ফাতেমা (রাঃ) সহ সবাইকে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, আত্মীয়তার অধিকার সেই সমস্ত বস্তুসমূহের মধ্যেই সম্ভব যেগুলি মানুষের আয়ত্তাধীন । আমার আয়ত্তে আমার ধনসম্পদ, যেগুলি বিতরণে আমি কার্পণ্য করিনা, কিন্তু যেগুলি আল্লাহপাকের একেবারেই নিজস্ব ব্যাপার সেখানে আমার কিছু করণীয় নেই । না পারি কারো অভিভাবক হতে আর না পারি কারও উকিল হতে । অতঃপর কিয়ামত বা মহাবিচারের দিনের জন্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রস্তুতি গ্রহণ কর আর দোজখ বা নরকাগ্নি থেকে পরিত্রানের জন্য নিজেই চিন্তাভাবনা করে রাখো । বোঝা গেল যে, বুযুর্গ ব্যাক্তির সঙ্গে আত্মীয়তা মহান আল্লাহর দরবারে কোনোও কাজে আসবে না, ব্যক্তির নিজস্ব আমল বা সৎকাজ ব্যতিত বেড়া পার হওয়া অসম্ভব ।" (তাকবিয়াতুল ইমান, পৃষ্ঠা-৫৬/৫৭)

সুতারাং নবী করীম (সাঃ) যদি নিজে বলেন, "জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও, আমি আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদের মুক্তি দিতে পারব না ।" তাহলে বুযুর্গানে দ্বীনরা কিভাবে কিয়ামতের দিনে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারেন ?

মৃত ব্যাক্তিদের নিকট সাহায্য চাওয়া শির্ক

হযরত নবী করীম (সাঃ) সেই সময় পৃথিবীতে পদার্পণ করেছিলেন, যখন পূর্ববর্তী নবীদের দেওয়া শিক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাদের দেখানো পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, জগৎবাসী একত্ববাদ ভূলে গিয়েছিল, সব জায়গায় সৃষ্ট পদার্থের পূজা হচ্ছিল । সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্র, আগুন, পানি, মূর্তি প্রভৃতির পূজা হচ্ছিল, আল্লাহর ধর্ম পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, কুফরের ঘনঘটা অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করে নিয়েছিল । সেই সময় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পৃথিবীতে আগমন করা পৃথিবীবাসীদের জন্য সাধারণ ব্যাপার ছিল না ।

প্রিয় পাঠক ! সমস্ত আম্বিয়া (আঃ) এই জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন যাতে মানব জাতিকে শিক্ষা দেওয়া যায় যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শির্ক করবে না,

একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে । এবং মানুষকে এইজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু মানুষ প্রবৃত্তি ও হঠকারীতার তাড়নায় ভুলে যায় বা জিদের বশবর্তী হয়ে উলটো কাজ করতে লেগে যায় ।

যেসব ওলী (রহঃ) মারা গেছেন তাঁদের নিকট জীবিত লোকদের কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করাকে কবর পূজারীদের ভাষায় যাকে বলা হয় 'ইস্তেমদাদে রুহানী' । যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে বিদ্‌আত ।

কুরআন শরীফে মহান আল্লাহপাক বলেছেন, ''ইয়্যাকা নাঅ্‌বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়ীন'' অর্থাৎ (হে আল্লাহ !) আমরা একমাত্র তোমারই উপাসনা করি এবং একমত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি ।

ইমাম রাযীর ভাষায় ''ইয়্যাকা নাসতায়ীন'' মানে ''লা আসতায়ীনু বিগাইরিকা'' অর্থাৎ '(হে আল্লাহ !) তোমাকে ছাড়া আর কারো নিকটই আমি কোন প্রকারের সাহায্য চাই না ।' তাহলে আওলিয়ায়ে কেরামদের কবরে সাহায্য প্রার্থানা করার ফতোয়া কবর পূজারীরা লাভ করলেন কোথা থেকে ?

প্রিয় পাঠক ! একটু চিন্তা করে এবং বুঝে দেখুন যারা প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে বার বার সুরা ফাতেহা পড়ার সময় (যারা দিনে ৪৮ বার) আল্লাহর সামনে একথা স্বীকার করেন, ''ইয়্যাকা নাঅ্‌বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়ীন'' (একমাত্র তোমারই উপাসনা করি এবং একমত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি) এই আয়াত বার বার পড়েন এবং একথা স্বীকারও করেন আর যখন নামায পড়া হয়ে যায় এবং মসজিদে নামাযে মুসাল্লা থেকে যখন উঠেন তখন আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে হাযির-নাযির মনে করে এবং লাভ লোকসানের সাহায্যকারী মনে করে তাদের নামে শ্লোগান লাগান । প্রিয় পাঠক ! এবার আপনারাই ইনসাফ করে বলুন, এদের অজ্ঞতার কোন পরিসীমা আছে ?

তাছাড়া নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সাহায্য কেবল আল্লাহর নিকটই চাইতে হবে । অন্য কারো নিকট নয় । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ''তুমি যদি কোন কিছু প্রার্থনা কর, আর যদি তুমি কোন সাহায্য চাও তাহলে সাহায্য চায়বে আল্লাহর নিকট ।''

বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ‘‘তুমি যদি কোন কিছু প্রার্থনা কর, আর যদি তুমি কোন সাহায্য চাও তাহলে সাহায্য চায়বে আল্লাহর নিকট ।’’

মরে যাওয়া লোকেরা পার্থিব দুনিয়ার লোকেদের কোন ফরিয়াদ শুনতে পায়না । আর শুনতে পেলেও তাদের কিছু করার ক্ষমতা থাকে না । কারণ মহান আল্লাহপাক কুরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন, ‘‘ইন্নাকা লা তুসমিউল মাওতা’’ অর্থাৎ তুমি মরে যাওয়া লোকেদের কোন কথা শোনাতে পারবে না । (সুরা - আনফাল)

মহান আল্লাহপাক কুরআনে করীমে অন্যত্র বলেছেন, ‘‘ফাইন্নাকা লা তুসমিউল মাওতা’’ অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি হে নবী ! মরে যাওয়া লোকেদের কিছু শোনাতে পারবে না ।

হাদীস শরীফে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ‘‘জেনে রাখ, সমস্ত মানুষও যদি একত্রিত হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবে তারা তা করতে পারবে না ততটুকু ছাড়া যা আল্লাহ তোমার জন্যে নির্দিষ্ট করে লিখে দিয়েছেন । অনুরুপভাবে সমস্ত মানুষও যদি তোমার একবিন্দু ক্ষতি করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তবুও তারা কিছু করতে পারবে না কেবল ততটুকু ছাড়া যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, বস্তুত কলম তো তুলে নেওয়া হয়েছে, কাগজের কালিও শুকিয়ে গেছে ।’’

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আলেম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, ‘‘শির্‌ক হওয়ার ধারণা হয় যেসব ক্ষেত্রে, তার মধ্যে এও একটি যে, লোকেরা আল্লাহ ছাড়া অপরের নিকট রোগীর রোগ মুক্তি ও গরীবকে ধন দেওয়া প্রভৃতি প্রয়োজন পূরণের জন্য দুয়া করে, তাদের জন্য মানত মা’নে, এসব মানত থেকে নিজেদের কামনা পূরণ হওয়া পোষন করে, তাদের মানে তেলাওয়াত করে বরকত লাভের আশায় । এজন্যে আল্লাহ লোকদের উপর ওয়াজীব করে দিয়েছেন যে, তারা নামাযে বলবে ঃ হে আল্লাহ, আমরা কেবল তোমারই বন্দেগী করি, কেবল তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি । আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ আল্লাহর সাথে আর কাউকেও ডাকবে না । এ ডাকা নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ ইবাদত করা থেকে নিষিদ্ধ নয় - যেমন কোন কোন তফসীরকার মনে করেছেন । বরং এর অর্থ হচ্ছে অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা নিষেধ । কেননা আল্লাহ অপর আয়াতে বলেছেন ঃ কেবল আল্লাহকেই ডাকবে । ফলে তোমরা যা চাও, তিনি তা তোমাদের জন্য খুলে দেবেন ।’’ (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর একজন জবরদস্ত নবী ছিলেন । যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতা আজরকে বললেন, ‘‘হে আব্বাজান ! আপনি এইসব মূর্তিগুলোকে কেন পুজা করছেন যারা না দেখতে পায়, না শুনতে পায় এবং না আপনার কোন কাজ করতে পারে ? হে আব্বাজান ! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে নাই । আপনি আমার কথা অনুসরণ করে চলুন, আমি আপনাকে সোজা রাস্তায় চালাব । হে আমার আব্বা ! আপনি শয়তানের পথ অনুসরণ করবেন না, শয়তান করুনাময় খোদার কঠিন শত্রু । হে আমার আব্বা আমি ভীত এই জন্য যে আপনার উপর কোন কঠিন শাস্তি না এসে যায় এবং আপনি না শয়তানের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান ।

প্রিয় পাঠক ! জগৎবাসী জানে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতা আজর মূর্তিও তৈরী করত, এবং বিক্রিও করত এবং পূজাও করত । যখন ইব্রাহীম (আঃ) নিজের পিতাকে বুঝালেন তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে কঠিন জবাব দেওয়া হল । যদিও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে আল্লাহ নিজের খাস বান্দা করে নিয়েছিলেন । হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কোন ‘ওহাবী’ ত ছিলেন না এবং দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেও আসেন তো আসেন নি । বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সত্যিকারের নবী হয়ে এসেছিলেন । এবার বলুন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বোঝানোতে তাঁকে যে জবাব দেওয়া হল তা কুরআন শরীফে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, ‘‘সে (আজর) জবাবে বলল, হে ইব্রাহীম (আঃ) তুমি আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে (এবং আমাদের ধর্মকে) খারাপ বলছ, তুমি আমাদের কাছ থেকে দুর হয়ে যাও (আমাকে মুখ দেখাবে না) তা নাহলে আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলব ।’’

এই ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতার দেওয়া জবাব । এই সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মানসিক পরিস্থিতি তার ধারণা আপনারা করতে পারেন । এই একই অবস্থা আমাদের মূর্খ মুসলমান ভাইদের । যখন তাদেরকে একত্ববাদ ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নতের উপর আমল করার জন্য বোঝানো হয় । কবর পূজা, তাজিয়া পূজা, রসম পূজা প্রভৃতি ছেড়ে দেওয়ার জন্য বোঝানো হয় তখন সেই বুঝানেওয়ালাদেরকেও ঠিক সেই রকম জবাব দেওয়া হয় যে জবাব হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পেয়েছিলেন । এখানেও বুঝানেওয়ালাদেরকে গালি গালাজ, অভিসম্পাত করতে লেগে যায় । মার পিটের মামলা পর্যন্ত এসে যায় এবং কিছু কিছু জায়গায় তো শহীদ পর্যন্ত করে দেওয়া হয় । সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদেরকে দেওবন্দী, ওহাবী, বেদ্বীন-কাফের প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে মসজিদ থেকে

বের পর্যন্ত করে দেওয়া হয় । তাদের বক্তৃতা এবং ইজতেমাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় যেরকম হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সত্য বলার জন্য, বাতিলদের বিরোধীতা করার জন্য জ্বালিয়ে দেওয়ার পরামর্শ হয়েছিল ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে আগুনে যখন ফেলে দেওয়া হল তখন (তাঁর মুখ দিয়ে) শেষ কলমা এটাই ছিল, "আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট ।" (বুখারী শরীফ)

প্রিয় পাঠক ! এবার শুনুন কবরে গিয়ে মুর্দাদের কাছে চাওয়া সম্পর্কে ইমামে আযম হযরত আবু হানীফা (রহঃ) এর বক্তব্য কি ? 'তফসিরে জামেউত' তফসীরের সূরা ফাতির এর তফসীর থেকে একটি ঘটনা যে ঘটনাটি শাহ ইসহাক দেহলবী (রহঃ) ইমা আবু হানীফা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন । ঘটনাটি হল ঃ

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) দেখলেন, এক ব্যাক্তি নেক লোকদের (ওলী) কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে সালাম করছে, তাদের সম্বোধন করে বলছে ঃ "ইয়া আহলাল কুবুরী হাল লাকুম মিন খাবরি ওয়া হাল ইনদাকুম মিন আশরিন ? ইন্নি তা'তাইতাকুম কুম ইল্লাদুয়াআ দারাইতুকুম আফালতুম ।"

অর্থাৎ 'হে কবরবাসীরা ! তোমাদের কি কোন খবর আছে ? তোমাদের আছে আছে কোন ক্ষমতা ? আমি তো তোমাদের কাছে কয়েক মাস ধরে আসছি, তোমাদের ডাকাডাকি করছি । তোমাদের নিকট আমার জন্য কোন প্রার্থণা ছিল না । কিন্তু তোমরা তা টের পেয়েছ, না একেবারে গাফিল হয়ে পড়ে রয়েছ ?'

একথা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) শুনতে পেলেন । তিনি লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হাল আজাবুলাকা" অর্থাৎ 'কবরবস্তু লোকেরা কি তোমার ডাকের কোন জবাব দিল ?' লোকটি বলল, "না কোন জবাব পাইনি ।" তখন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বললেন ঃ "সুহকান ওয়া তারিবাত ইয়াদাকা কাইফা তুকাল্লিমু আজসাদান লা ইয়াসতাতীউনা জাওয়াবান ওয়ালা ইয়ামলিকুনা শাইয়ান ওয়ালা ইয়াসমাউনা সাওতান ওয়া সুম্মা কারাআ ওয়ামা আনতা বিমুস্‌মিয়িম্মান ফিল কুবুরি ।" অর্থাৎ বড়ো দুঃখ, বড়ো লজ্জার বিষয় । তোমার দুটো হাত ধ্বংস হয়ে যাক । তুমি এমন সব দেহকে লক্ষ্য করে কথা বলছ যারা জবাবই দিতে পারেনা, যাদের কোনো কিছুই করার ক্ষমতা নেই, (এমনকি) কোন আওয়াজও যারা

শুনতে পায়না । অতঃপর তিনি পড়লেন (কুরআনের আয়াত) ঃ তুমি শোনাতে পারবে না যাদের, যারা কবরে রয়েছে । (সংগৃহীত ঃ সুন্নাত ও বিদ্‌আত/মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, পৃষ্ঠা ২১৬-২১৭)

এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এই মত পোষন করতেন যে, ওলী বা নেক লোকদের কবরে গিয়ে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থণা করা সম্পূর্ণ নাজায়েয । বিপদ থেকে উদ্ধার করা, নিঃসন্তানকে সন্তান দান করা বা চাকুরী - ব্যাবসায় উন্নতি দান করার কোন সাধ্যই তাঁদের নেই ।

এই প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ পাক ঘোষনা করেছেন, ‘‘ফালা ইয়ামলিকুনা ফাসফাস্‌সির্‌রি আনকুম ওয়ালা তাহবিলান ।’’ অর্থাৎ না ওরা তোমাদের বিপদ দুর করতে এবং তোমাদের জন্য আসা বিপদকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে কস্মিনকালেও পারবে না ।

কুরআন শরীফে অন্যত্র মহান আল্লাহপাক বলেছেন, ‘‘যে লোক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে সে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকের জবাব দেবে না, তার চাইতে অধিক গুমরাহ আর কে হতে পারে ? ওরা তো তাদের দুয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ।’’ (সূরা আল আরাফ, আয়াত ঃ ৫)

তিনি আরও বলেছেন, ‘‘উদ্‌উনী আসতাজিব লাকুম’’ অর্থাৎ আমার নিকট তোমরা প্রার্থণা কর । আমি তোমাদের প্রার্থণার জবাব দিব । (সূরা আল মুমিনুন)

আর আল্লাহ পাকই যদি প্রার্থণার জবাব দেন বা প্রার্থণা কবুল করেন তাহলে বালা - মুসিবতের সময় ওলীদের কবরে গিয়ে ধর্ণা দেওয়ার প্রয়োজন কি ? নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ‘‘আদ্দুয়াউ হুয়াল ইবাদিহি’’ অর্থাৎ দুয়া ও প্রার্থণাই ইবাদত । আর ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে করা কুফ্‌রী । তাহলে ওলীদের দরবারে পার্থিন প্রয়োজনের ব্যাপারে দুয়া ও প্রার্থণা করা কিভাবে জায়েজ হতে পারে ? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেছেন, ‘‘আদ্দুয়াউ মাখাল ইবাদিহি’’ অর্থাৎ দুয়া ও প্রার্থণাই ইবাদতের মগজ ও আসল বস্তু ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (সাঃ) একবার এক ব্যাক্তিকে তাওবাহ করতে বলায় লোকটি বলল, আমি শুধু লা-শরীক আল্লাহর নিকট তাওবাহ করবো, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নিকট নয় । তার কথা শুনে হুযুরে পাক (সাঃ)

বললেন, তুমি হকদারের হক ঠিকই চিনেছো। হযরত আয়েশার (রাঃ) সাধ্বীতার স্বপক্ষে আয়াত নাযিল হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) আয়েশাকে (রাঃ) বললেন, আয়েশা ! দাঁড়িয়ে আল্লাহর নবীর নিকট মস্তক চুম্বন কর। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম আমি তা করব না। আমি আল্লাহ ব্যাতিত কারও কাছে কৃতজ্ঞ নই। হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করলেন, আবু বকর ওকে ছেড়ে দাও, কিছু বলো না। অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশার পিতা আবু বকর (রাঃ) জবাব দিলেন, শোকর আল্লাহ পাকের এতে আপনার ও আপনার সঙ্গীর (অর্থাৎ রাসুলুল্লাহর) কোন অনুগ্রহ নাই। হযরত রাসুলে করীম (সাঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) কথাই অস্বীকৃতি জানালেন না, যদিও তাঁর সাধ্বীতার স্বপক্ষে হুযুরে পাকের (সাঃ) পবিত্র রসনার মাধ্যমে আল্লাহর ওহী এসেছে। কোন নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ ব্যাতিত অন্য কারও পক্ষ থেকে মনে করা কাফেরদের নীতি। [ইহইয়াও উলুমিদ্দ্বীন, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা - ৩৭/মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)]

অনেক কবর পূজারী বলেন, "আমরা বুযুর্গানে দ্বীনদেরকে জান্নাত যাওয়ার 'ওসীলা' মনে করি।" এর জবাবে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) লিখেছেন, "যে তার অন্তরকে 'ওসীলা' বা মাধ্যম থেকে পবিত্র করে না, সে গুপ্ত শির্ক থেকে মুক্ত হয় না।" তবে বুযুর্গানে দ্বীনরা জান্নাতে যাওয়ার ওসীলা না হলেও তাঁদের 'ওসীলা' দিয়ে দুয়া চাওয়া নাজায়েজ নয়।

কুরআন শরীফে মহান আল্লাহপাক বলেছেন, "ফামাইঁ ইয়া'অ্মাল্ মিসক্বা-লা যার্‌রাতিন্ খাইরাইঁ ইয়ারাহ অমাইঁ ইয়া'অ্মাল মিসক্বা - লা যার্‌রাতিন্ শাররাঁই ইয়ারাহ।" (সুরা যিলযাল, আয়াত ৭,৮)

অর্থাৎ (কিয়ামতের দিন) কেউ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তার প্রতিফল পেবে এবং কেউ অনু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তারও প্রতিফল পাবে।

সুতরাং ব্যাক্তির অনু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তার প্রতিফল যদি কিয়ামতের ময়দানে পায় তাহলে বুযুর্গানের দ্বীমরা ব্যাক্তির কাজে আসবে ? পাঠকবর্গ একথা চিন্তা করে দেখবেন।

কবরসমূহকে ধ্বংস করে ফেলা ওয়াজীব

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, ‘‘যে সকল মসজিদ ও সৌধ - এমারত ও শহীদ মন্দিরসমূহ কবরের উপর বা মৃতলোকের নামে নির্মাণ করা হয়েছে, যাকে কেন্দ্র করে শির্‌ক ও বিদ্‌আতের ঢল প্রবাহিত হয়েছে, তার অনিষ্টতা মসজিদে দারারের তুলনায় কোন অংশে বেশী ছাড়া কম নয় । সুতরাং ধুলিস্যাত করে ফেলা যে মুসলমানদের উপর ওয়াজীব তার জ্বলন্ত প্রমাণ নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক ‘মসজিদে দারারকে’ ধুলিস্যাত করে দেওয়ার ঘটনাটি । ইসলাম তাকে জমিনের সাথে মিশিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে । এমনিভাবে সেই সকল মিনার ও গম্বুজসমূহ আমাদের ধ্বংস করে ফেলা উচিৎ, যা কবরের উপর বা শহীদ কিংবা মৃতলোকের স্মরণীকারুপে নির্মিত হয়েছে । কেননা তার ভিত্তিই রাখা হয়েছে নবী করীম (সাঃ) এর নাফরমানী ও বিরোধীতার উপর । আর যে সকল বস্তুর ভিত্তি আল্লাহর রসুলের অবাধ্যতা ও বিরোধীতার উপর রাখা হয়েছে সেই সকল সৌধ - এমারত, মিনার, গম্বুজ ও স্মরণীকাসমূহ ভেঙে চুরে মিসমার করে ফেলা মসজিদে দারারের তুলনায় বহুলাংশে অপরিহার্য্য কর্তব্য । এই সকল ভিত্তিসমূহ মিটিয়ে ফেলার অপরিহার্যতার প্রামাণিত দলীল হল, নবী করীম (সাঃ) এর কবরের উপর দালান - কোঠা ও মিনার গম্বুজ নির্মাণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং যারা কবরের উপর এই ধরণের দালান কোঠা ও মসজিদ নির্মাণ করে থাকে, তাদের উপর তিনি অভিশাপ দিয়েছেন । সুতরাং যেসব বস্তুর জন্য হুযুর (সাঃ) কঠোর নিষেধাজ্ঞার অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন এবং যার নির্মাণ কর্তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন, তা ধুলিস্যাতকরণ ও নাম - নিশানা মুছে ফেলার কাজ ত্বরান্বিত করা ও প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া মুসলমানদের জন্য সামরিক কর্তব্য ।’’ (আল বালাগুল মুবীন, পৃষ্ঠা - ২৯, ৩০)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, ইমাম মুসলিম নিশাপুরী (রহঃ) স্বীয় বিশ্ববিখ্যাত কিতাব আবুল হাইয়্যাজ আসাদী থেকে একটি হাদীস নকল করেছেন । উক্ত হাদীসে আবুল হাইয়্যাজ আসাদী (রহঃ) বলেন, আমাকে হযরত আলী (রাঃ) বললেন - এখন কি তোমাকে সেই কাজের জন্য প্রেরণ করব না, যে কাজের জন্য রসুলে করীম (সাঃ)আমাকে প্রেরণ করেছিলেন । তিনি আমাকে কোনো জীব - জন্তুর ছবি ও আকৃতি যখনই দেখিনা কেন, তা নস্যাত করে ফেলার জন্য এবং যেখানেইন উঁচু কবর পরিলক্ষিত হয়, তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবার জন্য প্রেরণ করেছিলেন ।’

প্রিয় পাঠক ! লক্ষ্য করুন এখানে হযরত আলী (রাঃ) বলছেন, তাঁকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উঁচু কবরকে অর্থাৎ মাযারকে ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার জন্য বলছেন । তাহলে আমরা হযরত আলী (রাঃ) এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসারীরা মাযার ধ্বংস করতে তৎপর হব না কেন ? কিন্তু হায়রে ! কবরপূজারীদের অত্যাচারে আমরা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হুকুম পালন করতঃ মাযার সমূহকে ধ্বংস করতে এবং তা মাটির সঙ্গে চারিয়ে (মিশিয়ে) দিতে পারছি না ।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, "মদীনা শরীফ থেকে মক্কা যাওয়ার পথে একটি গাছ ছিল, সেই গাছটির তলায় বসে হুযুর (সাঃ) মক্কার কুফ্‌ফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামদের কাছ থেকে বায়াত নিয়েছিলেন । সেই বায়াতকে আল কুরআনে 'বায়াতে রিজওয়ান' নামে অভিহিত করেছে । হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে দেখতে পেলেন, লোকেরা ঐ গাছটি খুব বরকতময় গাছ মনে করে তার কাছে খুব বেশী যাতায়াত করতে থাকে এবং সেখানে গিয়ে নফল নামায ইত্যাদি পড়তে থাকে । ভবিষ্যতে মানুষের দ্বারা ঐ গাছটির পূজা - পার্বন হবার এবং মানুষ শির্কের মধ্যে নিপতিত হবার আশঙ্কায় তিনি গছটিকে গোড়া থেকে কেটে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন, যাতে শির্কের ফিৎনা উদ্ভাবিত না হতে পারে । তাছাড়া হুযুর (সাঃ) মক্কা-মদীনার মধ্যপথে কোন একস্থানে নামায পড়েছিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) সেই স্থানে কিছু লোককে ফজরের নামাযের পর নামায পড়তে দেখে তাদেরকে ঐ স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করে বললেন, 'ফাইন্নামা হালাকা মান কানা কাবলাকুম বিমিশলি যালিকা কানু ইয়াত্তাবিউন আশারালবিয়ায়ি' অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকগণ এই কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে যে, তারা নবী রসুলগণের স্মরণীকা বস্তুগুলি এবং তাদের পদচিহ্ন অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকত । অর্থাৎ যে স্থানে নবী রসুলদের পদচিহ্নাবলী দেখতে পেত তারা তাকে খুব বরকতময় ভাবত এবং শ্রদ্ধনীয় সম্মানিত বস্তু বলে মনে করত ।" (আল বালাগুল মুবীন)

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, হযরত ওমর (রাঃ) দেওবন্দ মাদ্রাসায় পাশ করে আসা কোন মৌলবী ছিলেন না এবং মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের অনুসারী অর্থাৎ 'ওহাবী' ছিলেন না । তিনি নবী করীম (সাঃ) এর একজন জবরদস্ত সাহাবী ছিলেন এবং তিনি 'খোলাফায়ে রাশেদীন'দের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন । এবং তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর একজন খাঁটি অনুসারী ছিলেন । হযরত ওমর (রাঃ) যদি হুদায়বিয়ার বৃক্ষকে শির্ক বিদ্‌আতের আখড়ায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কায় যদি গোড়া থেকে কেটে নিশ্চিহ্ন করে দেন তাহলে আমরা নবীজী (সাঃ) এর অনুসারী এবং

হযরত ওমর (রাঃ) এর অনুসারীরা শির্ক বিদ্আতের আখড়ায় পরিণত হয়ে যাওয়া কবরসমূহ, আস্তানাসমূহ, পীরের থানসমূহ এবং সেই সমস্ত বৃক্ষ যেখানে শির্ক বিদ্আতের তান্ডব চলে সেগুলোকে কেটে মিসমার করে দিতে তৎপর হব না কেন ?

কবরে ফুল ও চাদর চাপানো

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) দুই কবরের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলেন । তখন তিনি বললেন, কবরে শায়িত এই দুই ব্যাক্তির উপর শাস্তি হচ্ছে । কোন মারাত্মক গুনাহের জন্য শাস্তি হচ্ছে না বরং তাদের মধ্যে একজন পেসাবের ছিটে থেকে বেঁচে থাকত না এবং দ্বিতীয়জন চুগোলখোরী করত । তখন নবীজী (সাঃ) একটি ডাল নিলেন এবং দু'টুকরো করলেন এবং এক টুকরো গেঁথে দিলেন । সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ! এরকম আপনি কেন করলেন ? তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আশা করা যায় যতদিন পর্যন্ত এটা শুকনো না হবে কবরবাসীর শাস্তি কম হবে । (বুখারী শরীফ, নাসাই শরীফ)

এটা হুযুর পাক (সাঃ) এর এক মুজিজা ছিল এবং তাঁর হাত মুবারকের এক বরকত ছিল । আমরা যদি গোটা গাছকে উপড়ে কোন কবরে গেঁথে দিই তাহলে কবরের শাস্তি কম হবে না । আমাদের উপর সম্ভাব্য শাস্তিকে কম করতে পারব না তাহলে অন্যের শাস্তি কিভাবে কম করতে পারব ? হুযুর (সাঃ) সেই ব্যাক্তির কবরে সতেজ ডাল গেঁথেছিলেন যাদের কবরে শাস্তি হচ্ছিল । এখন কবর পূজারীরা যদি এই হাদীস থেকে কবরে ফুল চাপানোর দলীল গ্রহণ করে তাহলে সর্বপ্রথম সেই কবরে যে শাস্তি হচ্ছে তা প্রমাণ করতে হবে যে কবরে ফুল চাপানো হবে । আর সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর এই ব্যাপারে একমত যে যাঁরা আল্লাহর ওলী হন তাঁদের কবরে শাস্তি হয় না ।

হুযুর (সাঃ) একবারই সারা জীবনে সতেজ ডাল সেই দিন কবরের উপর লাগিয়েছিলেন, বার বার এরকম করেন নি, এবং করার হুকুমও দেন নি । আর যখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরজ করলেন যে নবীজী (সাঃ) এরকম কেন করলেন তখন নবীজী (সাঃ) বললেন, আশা করা যায় যে যতদিন পর্যন্ত এই ডাল সতেজ থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই কবরের উপর আজাব কম হতে থাকবে । অর্থাৎ আশার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন এরকম বলেন নি যে আজাবই হবে না । এর নকল কিছু কিছু মানুষ আজকাল ভারতবর্ষে করে থাকেন এবং আওলিয়ায়ে কেরাম (রহঃ) দের

কবরের উপর ফুলের পাহাড় লাগিয়ে দেন । তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ মানুষের উদ্দেশ্য এই থাকে যে তিন রবিবার বা পাঁচ বারিবার বা সাত রবিবারে ওলীদের কবরে ফুল চড়ালে এবং ফাতেহাখানী করলে মুশকিল লাঘব হয় । এই উদ্দ্যেশে আওলিয়ায়ে কেরামদের মাযারে যাওয়া কুফ্‌রী । এবং যদি এই উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে আওলিয়াদের কবরে আজাব হয় না তাহলে ফুল চাপানোর মানে কি ?

যদি কবরের আজাবকে কম করার উদ্দেশ্যে ফুল চাপানো হয় তাহলে আওলিয়াদের কবরে নয় বরং সাধারণ মানুষের কবরে চাপানো উচিৎ, অর্থাৎ মদখোর - মাতাম, চোর - ডাকাত, জুয়াড়ি, বেনামাযী, অত্যাচারী, ফাসিক, ফাজির প্রভৃতিদের কবরে ফুলের পাহাড় লাগানো উচিৎ যাতে তাদের কবর আজাব কম হয় । এবং যদি পূন্যের উদ্দেশ্যে ফুল চাপানো হয় তাহলে আউলিয়াদের এবং সাধারণ মানুষের কবরে দু'জায়গায় সওয়াবের নিয়তে সমানভাবে চাপানো উচিৎ বরং সওয়াবের হকদার সাধারণ মানুষের কবর ।

প্রিয় পাঠক ! এসব প্রচলিত প্রথা যা পূর্ব - পুরুষদের দেখাদেখি চলে আসছে, "ফুল চাপালে সওয়াব হয় এবং আমাদের ফুল চাপালে কোন কবরবাসীর নিশ্চয় আজাব কম হয়" এই প্রথার উদ্ধৃতি আপনারা কোন গ্রন্থে পাবেন না । এবং যারা ফুল চাপায় তাদের বেশীরভাগ মানুষ এমনই হয় যে নামায, রোজা এবং রাসুলের সুন্নাতের উপর আমল করতেও অলসতা করে । তাহলে এরকম মানুষ অন্যের শাস্তি কিভাবে কম করবে যাদের মাথার উপর আজাবের ঘন কালো বাদল ছেয়ে আছে ?

আপনারা যখন মাযারে রবিবার দিন ফাতেহা পড়ার জন্য যাবেন তখন আমার এই কথা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখে নিবেন, যত মানুষ মাযারে আসে তাদের মধ্যে একশো মানুষের মধ্যে নিরানব্বই জন বেনামাযী পাবেন । যারা কবরে ফুল চাপায় তাদের মধ্যেও এবং যারা ফুল বিক্রি করে তাদের মধ্যেও ।

যখন আসর এবং মগরিবের নামাযের সময় আসে এবং মুআজ্জিন আযানে বলেন, "হাইয়্যা আলাস্‌সালাহ - হাইয়্যা আলাল ফালাহ" (অর্থাৎ এসো নামাযের দিকে, এসো কল্যানের দিকে) সেই সময় আপনি বুঝতে পারবেন যে দরগাহ শরীফে খাদেমগিরী যারা করেন এবং যারা সাজ্জাদানশীন হয়ে বসে আছেন তাঁরাও নামায পড়েন না । কারণ রবিবার সন্ধায় মানুষের ভিড় লোকে-লোকে লোকারণ্য হয়, এই খাদেম সাহেবানদের রোজগারের সময় এবং সপ্তাহে এই সময় একবারই আসে এটা

ছেড়ে তাঁরা কোন মতেই নামায পড়তে যাবেন না। বরং কিছু খাদেম সাহেবান তো নামাযই পড়েন না, তাহলে ফুল যারা চাপান এবং ফুল যারা বিক্রি করেন তারা কিভাবে নামায পড়বেন। (শরীয়াত ইয়া জেহালত, পালন হাক্কানী)

কবরে চাদর চাপানো সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - "আল্লাহ তাআলা আমাকে কবরে কাপড় (চাদর) বিছিয়ে দিতে হুকুম করেননি।" (আবু দাউদ শরীফ)

আর কবরে চাঁদোয়া বিছানো সম্পর্কে আল্লামা শামী (রহঃ) 'সিরাতে শামী' গ্রন্থে লিখেছেন, "ইয়ুক্‌রাহুস সুতুরু আলাল কুবুর" অর্থাৎ "কবরে চাঁদোয়া লাগানো মাকরুহ।"

তাহলে একথা প্রমাণ হয়ে গেল যে কবরে ফুল চাপানো, কবরে চাদর চাপানো এবং কবরে চাঁদোয়া লাগানো সম্পূর্ণভাবে হারাম এবং নাজায়েয কাজ।

কবরপূজারী ও মূর্তিপূজকদের মধ্যে সাদৃশ্য

ভারতীয় উপমাহাদেশে মূর্তি পূজারী বলতে বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরকেই বলা হয়। প্রিয় পাঠক ! লক্ষ্য করে দেখুন মূর্তি পূজারী হিন্দুদের মধ্যে কবরপূজারী মুসলমাদের সঙ্গে কি মারাত্মক সাদৃশ্য রয়েছে।

১) হিন্দু ভায়েরা প্রত্যেক বছর নিজেদের বুযুর্গদের (শিব, পার্বতি, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রম্ভা, সরস্বতী প্রভৃতি) জন্মদিন ও মৃত্যুদিন পালন করে থাকেন।

কিছু মুসলমান ভাইও নিজেদের বুযুর্গদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন পালন করে থেকেন।

২) হিন্দু ভায়েরা যেখানে চান সেখানে মন্দির তৈরী করে নেন এবং পূজা পার্বন করতে শুরু করে দেন।

কিছু মুসলমান ভাইও যেখানে চান মাযার, ছিল্লা, তাজিয়া তৈরী করে শির্‌ক-বিদ্‌আতের আখড়ায় পরিণত করে নেন।

৩) হিন্দু ভায়েরা প্রত্যেক বছর নিজেদের দেব দেবীর জন্য মেলা করেন এবং সেখানে নারী - পুরুষ নির্বিশেষে ঘোরা ফেরা করেন ।

কিছু মুসলমান ভাইও মাযারে উরুষ পালন করেন এবং পর্দার কোন পারোয়া না করে নারী - পুরুষ নির্বিশেষে ঘোরা ফেরা করেন ।

৪) হিন্দু ভায়েরা প্রত্যেক বছর নিজেদের দেব দেবীর মূর্তি গুলোকে স্নান করান এবং সেই স্নান করানোর পানিকে পবিত্র মনে করেন ।

কিছু মুসলমান ভাইও নিজেদের বুযুর্গানে দ্বীনদের কবরকে প্রত্যেক বছর গোসল (স্নান) করান এবং সেই গোসল করানোর পানিকে তাবার্‌রুক বা বরকতপূর্ণ মনে করেন ।

যদিও শরীয়াতে পুরো মানব শরীয়াতী আইন অনুযায়ী ধৌত করাকে গোসল (স্নান) বলা হয় । তাহলে কবর ধোয়াকে গোসল বলা শরীয়াতকে নিয়ে বাড়াবাড়ি নয়তো আর কি ?

স্নানের পানি হয় নাপাক যেমন নাজাসাতের গোসল, হয় পাক কিন্তু ব্যাবহার অযোগ্য, যেমন মোস্তাহাব গোসল । এই হল গোসলের পানির শরীয়াতী হুকুম কিন্তু শরীয়াতকে বাড়াবাড়ি করনেওয়ালারা কবর ধোয়া পানিকে আল্লাহর হুকুমের চেয়ে বাড়িয়ে না কেবল ব্যাবহারের উপযোগী করলেন বরং তাবার্‌রুক বানিয়ে দিয়ে শরীয়াতে দ্বিতীয় বাড়াবাড়ি করলেন ।

৫) হিন্দু ভায়েরা মূর্তিকে স্নান করানোর পর প্রত্যেক বছর তাকে নতুন কাপড় পরান এবং কাপড় পরানোর পর ফুলের হারও পরান ।

কিছু মুসলমান ভাইও মাযারকে গোসল দেওয়ার পর প্রত্যেক বছর কাপড়ের নতুন চাদর চাপান । চাদর চাপানোর পর ফুলের চাদরও চাপান বা তার উপর ফুল ছড়ান ।

৬) হিন্দু ভায়েরা মূর্তির পায়ে চুমো - চাটা করেন এবং সিজদা করেন ।

কিছু মুসলমান ভাইও দরগাহ শরীফে চুমো - চাটা করেন এবং সিজদা করেন ।

৭) হিন্দু ভায়েরা দেবদেবীর নামে মানত (মানসিক) মানেন ।

কিছু মুসলমান ভাইও বুযুর্গানে দ্বীনদের নামে মানত (মানসিক) মানেন ।

৮) হিন্দু ভায়েরা প্রসাদ চড়ান এবং সেই প্রসাদ আল্লাহর সৃষ্ট মখলুকদের খাওয়ান অথবা লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেন ।

কিছু মুসলমান ভাইও বুযুর্গানে দ্বীনদের নামে নিয়াজ ও নযর চড়ান আল্লাহর সৃষ্ট মখলুকদের খাওয়ান অথবা লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেন ।

৯) হিন্দু ভায়েরা দেবদেবীদের সাহায্যকারী মনে করেন । কিছু মুসলমান ভাইও বুযুর্গানে দ্বীনদের হাজত পুরণকারী মুশকিল কুশা মনে করেন ।

১০) হিন্দু ভায়েরা দেবদেবীদের সব জায়গায় সব সময় হাযির - নাযির মনে করেন ।

কিছু মুসলমান ভাইও বুযুর্গানে দ্বীনদের সব জায়গায় সব সময় হাযির নাযির মনে করেন । (যদিও ফাতাওয়ায়ে বাজ্জাজিয়ায় লেখা আছে, ‘‘মান কানা আন্না আরওয়াহাল মাশায়িখি হাযিরাতান ওয়া তাঅ্লামুহা কাফারা’’ অর্থাৎ মাশায়িখ তথা পীর বুযুর্গদের রুহ হাযির নাযির হয় তারা সব কিছু জানে বলে যে বিশ্বাস করবে সে কাফির হয়ে যাবে । হানাফী মাযহাবের এই ফতোয়া কবর পূজারীরা বিশ্বাস করেনা ।)

১১) হিন্দু ভায়েরা মূর্তির সামনে চিরাগ জ্বালান এবং ধুনি জ্বালিয়ে তার ধুঁয়ার সুগন্ধী দেন ।

কিছু মুসলমান ভাইও দরগাহে চিরাগ জ্বালান এবং লোবানের ধোঁয়া দেন অথবা আগরবাতি জ্বালান ।

১২) হিন্দু ভায়েরা মূর্তির সামনে তাবলা, হারমোনিয়াম বাজান এবং খুব গান করেন এবং নাচেন । কিছু লোক কীর্তন ভজন প্রভৃতি করেন ।

কিছু মুসলমান ভাইও মাযারে ঢোলক, হারমোনিয়াম বাজিয়ে খুব কাওয়ালী করেন ।

১৩) হিন্দু ভায়েরা দেবদেবীর মূর্তি তৈরী করতে এবং মন্দির তৈরী করতত এবং সাজাতে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা খরচ করেন এবং সেগুলোকে পূণ্যজনক কাজ মনে করেন ।

কিছু মুসলমান ভাইও দরগাহগুলিকে, তাজিয়াকে তৈরী করতে এবং সাজাতে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা করচ করেন এবং সেগুলোকে সওয়াব ও নাজাতের মাধ্যম বলে মনে করেন ।

১৪) হিন্দু ভায়েরা প্রত্যেক মন্দিরের সংরক্ষণের জন্য একজন পূজারী রাখেন এবং তাকে দেবদেবীর খাদেম (সেবক) বা গদ্দীনশীন বলা হয় ।

কিছু মুসলমান ভাইও দরগাহ শরীফের সংরক্ষণের জন্য একজন খাদেম রাখেন দরগাহ শরীফের সাজ্জাদাহ বা গদ্দীনশীন বলা হয় ।

১৫) হিন্দু ভায়েরা মন্দিরে জুতা সঙ্গে নিয়ে যাওয়াকে পাপ বলে মনে করেন অর্থাৎ পূজারী কাউকে জুতো হাতে করে নিয়ে আসতে দেন না ।

কিছু মুসলমান ভাইও জুতো হাতে করে নিয়ে দরগাহ শরীফে যাওয়াকে গুনাহ (পাপ) বলে মনে করেন এবং সেখানকার সাজ্জাদাহ বা গদ্দীনশীন কোন মানুষকে জুতো হাতে করে নিয়ে দরগাহ শরীফে ফাতেহা পড়ার জন্য যেতে দেন না এবং খুব কঠোরতার সঙ্গে আটকানো হয় যদিও মসজিদে আপনারা জুতো হাতে করে নিয়ে যেতে পারেন ।

১৬) কিছু হিন্দু ভায়েদের উপর মাতা - দেবদেবীর ভর করেন সেই সময় তিনি বেকাবু হয়ে মাথা নড়াতে থাকেন এবং ঝুমতে থাকেন ।

কিছু মসলমান ভায়েদের উপরও ওলী কিংবা ইমাম প্রভৃতি ভর আসে তখন তাঁরা বেকাবু হয়ে মাথা নাড়তে থাকেন এবং নাচতে লেগে যান ।

১৭) হিন্দু ভায়েরা প্রত্যেক বছর রামলীলা করেন এবং বিভিন্ন ধরণের জানোয়ারের রুপ ধারণ করে নাচাকুদা করতে থাকেন এবং গান বাজনাও করতে থাকেন ।

কিছু মুসলমান ভাইও তাজিয়াতে লঙ্গুর, চিতা, ভালুক প্রভৃতি তৈরী করেন তারপর খুব নাচাকুদা করেন এবং ঢোল, তবলা, সানাই প্রভৃতি বাজান এবং মুর্শিয়া গান ।

১৮) হিন্দু ভায়েরা নিজেদের আত্মীয় স্বজন মারা যাওয়ার পর তৃতীয়া,দশমী, ষোড়শী প্রভৃতি করেন ।

কিছু মুসলমান ভাইও নিজেদের আত্মীয় স্বজন মারা যাওয়ার পর তৃতীয়া, চতুর্থী (চাহরম), দশমী, বিশওয়াঁ, চাল্লিশা প্রভৃতি করেন ।

১৯) হিন্দু ভায়েরা নিরিবিলি অবস্থায় চোখ জোর করে দেবদেবী কিংবা ভগবানের ধ্যান জমান কিংবা নিজেদের গুরুর ধ্যান জমান অর্থাৎ তাদের আকৃতি চোখের সামনে নিয়ে আসেন ।

কিছু মুসলমান ভাইও নিরিবিলি অবস্থায় চোখ জোর করে নিজেদের পীর - মাশায়েখ বা ওলীর ধ্যান করেন এবং তাদেরকে নিজেদের ধ্যান কিবলা (কাবা) বানিয়ে দেন এবং কিছু মুসলমান ভাই তো পীরের ধ্যান করে সিজদাহও করে থাকেন ।

২০) হিন্দু ভায়েরা নিজেদের দেবদেবীর নামে জন্তু - জানোয়ার পালন করেন এবং সেই জন্তু - জানোয়ারগুলোকে তাদের নামেই উৎসর্গ করেন অথবা তাদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তাকে ভেট চড়ান (মানত করেন) এই নিয়তে যে দেবদেবীদের নৈকট্য অর্জন হবে ।

কিছু মুসলমান ভাইও বুযর্গানে দ্বীনদের নামে জন্তু - জানোয়ার পালন করেন এবং তাদের নামেই উৎসর্গ করেন অথবা মাযারে নিয়ে গিয়ে জবেহ করেন যাতে সেইসব বুযুর্গানের দ্বীনদের নৈকট্য অর্জন হবে ।

২১) হিন্দু ভায়েরা নিজেদের পূজা পার্বনে দেবদেবীর মূর্তি তৈরী করে খুব সাজান তারপর কিছুদিন পর সেই মূর্তিকে কাঁধে করে কিংবা লরিতে উঠিয়ে গ্রাম -

গঞ্জে, শহরে কিংবা বাজারের অলিতে গলিতে ঘোরাতে থাকেন সেই সময়ও সেই মূর্তির সামনে নাচাকুদা করতে থাকেব এবং খেল তামাশা করে বাজনা বাজিয়ে খুব ধুমধামের সঙ্গে নিয়ে যান এবং সন্ধার সময় সেই মূর্তিটাকে দরিয়া বা কোন ঝর্ণা বা দীঘিতে ডুবিয়ে দেন ।

কিছু মুসলমান ভাইও তাজিয়া তৈরী করে এবং তাকে খুব সাজান, তার সামনে কিছুদিন নাচাকুদা (মাতম) করতে থাকেন, খেল তামাশা (লাঠিখেলা) করতে থাকেন, ঢোল তাবলা এবং সানাই খুব বাজান তারপর দশই মহরমে নিয়ে গ্রামে গঞ্জে, শহরে কিংবা বাজারের অলিতে গলিতে ঘোরাতে থাকেন সেই সময়ও তাজিয়ার সামনে খুব করে নাচেন এবং মুর্শিয়া গেয়ে খেল তামাশা করতে থাকেন, ঢোল তাবলা সানাই প্রভৃতি বাজান তারপর সন্ধাবেলায় সেই তাজিয়াকে দরিয়াতে বা ঝর্ণাতে বা কোন দীঘিতে ডুবিয়ে দেন । দাফনও করেন না আর জানাযার নামাযও পড়েন না ।

আসল কথা হল, আমরা হলাম ভারতীয় মুসলমান এবং আমরা হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছি, সেইজন্য বাহ্যিকভাবে তো আমরা মুসলমান কিন্তু পুরাতন যে অভ্যাস ছিল সেগুলো এখনও যায়নি, কেবলমাত্র নামে পরিবর্তন হয়েছি মাত্র ।

হিন্দু ভায়েরা নিজেদের দেবদেবীর সঙ্গে যে আচরণ করে থাকেন মুসলমান ভায়েরা নিজেদের বুযুর্গদের সাথে সেই আচরনই করে থাকেন । যদিও শরীয়াতে সেইসব কাজগুলিকে কোনমতেই কাউকেই অনুমতি দেয় না । (শরীয়াত ও জেহালত/মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী)

কবর পূজারীদের মধ্যে প্রচলিত একটি জাল হাদীস

কবর পূজায় বিশ্বাসী লোকেরা তাদের মতের সমর্থনে যে কথাটি হাদীস বলে চালিয়ে থাকেন সেটি হল -

“অর্থাৎ তাহায়্যারতুম ফিল উমূরী ফাসতাঈনু মিন আহলাল কুবুরী”

অর্থাৎ "তোমরা যখন দুনিয়ার কোন কাজ - কমে হতবুদ্ধি, কাতর হয়ে পড়বে তখন কবরবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থণা কর।"

এই বাক্যটি অনেকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস হিসাবে পেশ করে থাকেন। বিশেষ করে কবর পূজারীরা তাদের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। অথচ হাদীসের সাথে এর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) বলেন, এটি নবীর হাদীস নয়। তিনি এ বাক্যকে কোন বুযুর্গের কথা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এভাবে এই হাদীসটাকে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভীও জাল বলেছেন। সিরিয়ার সাবেক গ্রান্ড মুফতী আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ বিন আব্দুল হালিম বিন সালাম ওরফে ইবনে তাইমিয়ার বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব 'সীরাতুল মুস্তাকীম' ও 'মাজলেসুন আবরার' প্রভৃতি কেতাবে এই হাদীসটিকে জাল বলে বর্ণনা করেছেন। ভরতবর্ষের প্রথম হাদীসের উস্তাদ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)ও এই হাদীসটাকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "কবর পূজারকগণ পথভ্রষ্ট হবার আর একটি কারণ হল যে, তারা মূর্তি পূজার চরিত্র গ্রহণ করে নিজেদের এই কুমর্মের সমর্থনে বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা হাদীস বানিয়ে নেয় এবং অবুঝ সরলপ্রাণ জনসাধারণকে এর দ্বারা ধোকা দিয়ে আল্লাহর পথ থেকে দুরে সরিয়ে ফেলে।"

তিনি আরও লিখেছেন, "এই ধরণের দ্বীন ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী মনগড়া হাদীস কবর পূজারীরা নিজেদের তরফ থেকে বানিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে বেড়াতে থাকে।"

তিনি আরও লিখেছেন, "এই হাদীসটি কবরপূজারীদের মনগড়া মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস। নিজেদের হীন স্বার্থে উদ্ধারের জন্যই নবী করীম (সাঃ) এর নামে এমনি মিথ্যা কথা চাপিয়ে দিয়েছে।" (আল বালাগুল মুবীন)

সুতরাং বিশেষজ্ঞগণ সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলেছেন যে, এ কথাটি মনগড়া, মিথ্যা। শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) সুরা বাকারার একটি আয়াতের তফসীরে লিখেছেন,

"পীর পূজারী (ও কবর পুজারী) লোকেরা বলে, বুযুর্গ লোকেরা খুব বেশী বেশী রিয়াজাত ও সাধনা মুজাহিদা করে বলে তাদের দুয়া ও সুপারিশ আল্লাহর দরবারে খুব বেশী গৃহীত হয়ে থাকে। এ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তাদের

রুহে অসীম শক্তি ও বিশালতার সৃষ্টি হয় । তাদের শেক্ল - সুরত যদি বরযখ বানানো হয় কিংবা তার বৈঠখানায় ও কবরস্থানে আজিজী ইনকেসারীর সাথে সিজদাহ করা হয়, তাহলে তাদের রুহ জ্ঞানের বিশালতার কারণে তা জানতে পারে এবং দুনিয়া - আখিরাতে সিজদাহকারীর কল্যানের জন্য তারা সুপারিশ করে ।” (তফসীরে আজিজী)

আল্লামা ইবনে তাইনিয়া (রহঃ) লিখেছেন,

“যে মনে করবে যে, আল্লাহর সন্তান আছে কিংবা তার কোনো শরীক আছে বা তাঁর অনুমতি ছাড়াই তাঁর নিকট শাফাআত করতে পারে অথবা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে এমন কিছু মাধ্যম রয়েছে, যা সৃষ্টির প্রয়োজনের কথা আল্লাহর নিকট পেশ করে কিংবা আল্লাহ ছাড়া এমন কতক ওলী - আল্লাহ রয়েছে, যারা আল্লাহ এবং সেই লোকদের মাঝে মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এ জন্যে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে - এই যার আকিদা হবে, সে তো আল্লাহ সম্পর্কে খুব জঘন্য ও অত্যন্ত খারাপ ধারণা পোষন করল ।”

কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, “ইন্নাল্লাযীনা তাদ্উনা মিনদূনিল্লাহি ইবাদুন আশমালুকুম” অর্থাৎ - ‘তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক, তারা তো তোমাদের মতোই দাসানুদাস মাত্র ।’

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) বলেছেন, “এ আয়াতে বিশেষভাবে কেবলমাত্র মূর্তি পূজারীদের জন্য নয়, বরং ‘মিনদূনিল্লাহ’ আল্লাহ ছাড়া সাধারণভাবে আর যে কেউ হোক না কেন, সেই এর মধ্যে শামিল এবং তাকে ডাকলেই স্পষ্ট শির্ক হবে । কেননা ওদের যে ডাকা হচ্ছে, মানুষের কোন একটি প্রয়োজন পূরণ করার ওদের কি ক্ষমতা আছে ? কেউ যদি বলে যে, এ আয়াত কাফেরদের সম্পর্কে প্রযোজ্য কেননা তারাই মূর্তিগুলোকে স্মরণ করে থাকে, তাহলে বলব ‘দুনিল্লা’ শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যাবহৃত কোন বিশেষ জিনিস যে বোঝায় না, তাই এ কথা স্বীকৃতব্য নয় ।”

হযরত মাওলানা আল্লামা শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, “মহান আল্লাহর ক্ষমতা এমনই যে তিনি ইচ্ছা করলে ‘কুন’ শব্দ দ্বারা কোটি কোটি নবী, অলী, জিন্ন, ফিরিস্তা, জিব্রাইল এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সমকক্ষ মুহূর্তের মধ্যে

সৃষ্টি করতে পারেন আবার এক ফুৎকারে আরশ থেকে জমীন পর্যন্ত সবই ধ্বংস দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করে দিতেও পারেন । তাঁর ইচ্ছায় সব কিছুর সৃষ্টি হয়ে যায়, স্ত্রীজাতি ও অন্যান্য কোন জিনিসেরই প্রয়োজন হয় না ।” (তাকবিয়াতুল ঈমান/পৃষ্ঠা - ৫১)

আর আল্লাহই যদি 'কুন' শব্দের দ্বারা সবকিছু করতে সামর্থহন তাহলে, দুনিয়ার কোনো কাজ-কর্মে হতবুদ্ধি কাতর হয়ে পড়লে তখন কবরবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থণা করার প্রয়োজন কি ? যাবতীয় কাজকর্মে, সমস্ত রকমের পার্থিব দুঃখ - কষ্ট, বালা মুসিবতের সময় আল্লাহ তাআলাই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? আল্লাহ পাক তো কুরআন শরীফের মধ্যে বলেই দিয়েছেন, “উদ্‌উনী আসতাজিব লাকুম” অর্থাৎ 'আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকের সাড়া দিব ।'

দুয়া কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে

কবরপূজারীরা যখন ওলীদের দরবারে সরাসরি কিছু চাইবার সমর্থনে কুরআনে হাদীসে প্রমাণ পেশ করতে না পারেন তখন যে অভিনব যুক্তির আশ্রয় নেন সেটি হল, “আমরা ত আর সরাসরি ওলীদের কিছু চাই না, বলি, হে অমুক ওলী, অমুক বাবা, তোমাদের পাক জুবান, তোমাদের দুয়া তাড়াতাড়ি আল্লাহর কাছে কবুল হয়, আল্লাহর কাছে দুয়া কর আমাদের যেন অমুক অমুক মনস্কামনা পূর্ণ হয় ।” ইত্যাদি ইত্যাদি । এটা নিতান্তই কবরপূজারীদের মনগড়া, জাল ও বানোয়াট কথা । এর সমর্থনেও কুরআন হাদীসে কোন প্রমাণ নেই । আর যেরকথার প্রমাণ কুরআন হাদীসে নেই সেই কথা আমরা মানতে পারি না, তাকে লোক যতই ভাল মনে করুক ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মুসলমানের প্রত্যেক দুয়াই কবুল হয় । কিন্তু শর্ত হল যে, কোন নাজায়েয কার্যের জন্য অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য যেন দুয়া না হয় ।

অন্য এক রেওয়াতে আছে, বান্দার যে সকল দুয়া দুনিয়াতে কবুল হয়নি বলে বাহ্যিকভাবে মনে হয় । যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাকে সেই সকল দুয়ার

সাওয়াব দান করবেন - তখন সাওয়াবের আধিক্য দেখে বান্দা আফসোস করে বলতে থাকবে যে, হায় ! যদি দুনিয়াতে একটি দুয়াও কবুল না হত ।

হযরত আবু যর ফিফারী (রাঃ) বলেন, আহার্য্য বস্তুর মধ্যে লবনের যে পর্যায় ইবাদতের মধ্যে দুয়াও সে পর্যায়ের ।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মানুষ যতক্ষণ তাড়াহুড়ো না করে ততক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গল ও কল্যানসহ থাকে । সাহাবাগণ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন - তাড়াহুড়ো বলতে কি বুঝানো হয়েছে ? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললনে, দুয়া করতে করতে এইরুপ বলা যে, বার বার দুয়া করছি - অথচ কবুল হয়না । দুয়া করতে করতে এতদিন চলে গেল অথচ এখনও দুয়া কবুল হয়নি ।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহঃ) একদিন কবরস্থানের দিকে যাচ্ছিলেন । পথিমধ্যে এক ব্যাক্তি বললেন, আমার জন্য দুয়া করবেন । হযরত রাবেয়া বসরী (রহঃ) বললেন, আল্লাহ পাক তোমার প্রতি রহম করুন । আল্লাহর অনুগত তাঁর ইবাদত কর । অতঃপর দুয়া কর । তিনি প্রত্যেক অস্থির ব্যাক্তির দুয়া কবুল করেন ।

হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন - ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আমি দুয়া করি কিন্তু দুয়া কবুল হয়না । রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হারাম মাল থেকে বেঁচে থাক । হারাম খাদ্যের এক লোকমা যার পেটে যায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার দুয়া কবুল হয়না । তিনি আরও বললেন, দুয়া করনেওয়ালার তাড়াহুড়ো না করা উচিৎ । আল্লাহ পাক প্রত্যেক দুয়া করনেওয়ালার দুয়া কবুল করেন ।

মহান আল্লাহ পাক কুরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন, "উদ্‌উনী আসতাজিবলাকুম" অর্থাৎ আমার কাছে দুয়া কর, আমি আমি তোমাদের দুয়া কবুল করব ।

সুতরাং হালাল খাদ্য ভক্ষণকারী প্রত্যেক মোমেন মুসলমানের দুয়া আল্লাহ পাক সরাসরি কবুল করে থাকেন । আর একথা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । তাহলে ওলীদের দরবারে একথা বলার প্রয়োজন কি "হে অমুক ওলী, অমুক বাবা, তোমাদের পাক জুবান, তোমাদের দুয়া তাড়াতাড়ি আল্লাহর কাছে কবুল হয়, আল্লাহর কাছে দুয়া কর আমাদের যেন অমুক অমুক মনস্কামনা পূর্ণ হয় ।"

একটি বিভ্রান্তিকর যুক্তি ও তার জবাব

কবরপূজারীরা শেষ পর্যন্ত তর্কে হেরে যে বিভ্রান্তিকর যুক্তির আশ্রয় নেন সেটি হল, বাদশাহের দরবারে যেতে গেলে যেমন প্রথমে বাদশাহের কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে হয়, কর্মচারী অনুমতি দিলে তবে বাদশাহের সঙ্গে দেখা করা বা যেকোন কাজকর্ম করা সম্ভব । ঠিক সেই রকম আল্লাহকে পেতে হলে ওলীদের দরবারে যাওয়া অবশ্যই প্রয়োজন । ওলীদের দরবারে না গেলে আল্লাহকে পাওয়া অসম্ভব । এককথায় তাঁদের কথা অনুযায়ী ওলীদের দরবারে যেতে হবে তবেই আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব, তাছাড়া সম্ভব নয় । সুতরাং আমার কবরপূজারী ভাইদের কথা অনুযায়ী ওলীরা হলেন আল্লাহর দরবারের কর্মচারী । আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই কবরপূজারীদের এই বিভ্রান্তিকর পেঁচালো জটিল যুক্তির ফাঁদে ফেঁসে গিয়ে তাদের মধ্যে শামিল হয়ে নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাতকে বরবাদ করে দিয়ে নিজেদের ঈমানের গলাতে ছুরি চালিয়ে বসেন ।

এখন আমার বক্তব্য কোন কাজের সিলসিলায় বাদশাহের কাছে যেতে হলে কর্মচারীর সাহায্য নিতে হয় ঠিকই, কিন্তু বাদশাহ যদি স্বয়ং কর্তার সম্মুখে হাযীর থাকেন তাহলে নিশ্চয় বাদশাহের কাছে দরকারী কোন কাজে কর্মচারীর কোন প্রয়োজন নেই । কর্মচারীর প্রয়োজন তখনই যখন বাদশাহ সম্মুখে উপস্থিত থাকেন না ।

অপরদিকে আমার মহান আল্লাহপাক এমনই অসীম ক্ষমতাধর বাদশাহ যে তিনি সব জায়গায় সব সময় প্রতি মুহুর্তে উপস্থিত থাকেন । এই বিশ্ব ব্রম্ভান্ড এমন কোন জায়গা নেই যেখানে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব বিরাজমান নেই । মহাকাশের গভীর অন্তরীক্ষে তিনি বিরাজমান, জমীনের অতল গহীন অভ্যন্তরেও তিনি বিরাজমান, মহাসমুদ্রের অতল তলেও তাঁর অস্তিত্ব বিরাজমান । তাহলে এই সব জায়গায় বিরাজমান মহান আল্লাহ পাককে পেতে হলে ‘ওলী’ নামক কর্মচারীর কি প্রয়োজন ?

সাধারনভাবে দেখা যায় দুনিয়ার বাদশাহর সঙ্গে আল্লাহর কোন তুলনাই হয় না । দুনিয়ার বাদশাহ যেকোন জায়গায় যেকোন সময় তন্দ্রা যান এবং ঘুমিয়ে যান, কিন্তু আল্লাহ কোন সময় তন্দ্রা যান না এবং ঘুমোন না, দুনিয়ার বাদশাহ সব জায়গায় কোন না কোন স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন, কিন্তু আল্লাহ কোন স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না; দুনিয়ার বাদশাহ মখলুক অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টি, কিন্তু

আল্লাহ মখলুক নন তিনি খালেক অর্থাৎ স্রষ্টা; দুনিয়ার বাদশাহ সবসময় কাজ করেন না কোন না কোন সময় বিশ্রাম নেন যেমন - রাত্রিবেলায়, কিন্তু আল্লাহর বিশ্রাম নেবার কোন প্রয়োজন হয়না; দুনিয়ার বাদশাহ বৃদ্ধ হয়ে যান এবং বৃদ্ধ হয়ে যাবার পর কর্ম হতে অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু আল্লাহ কোন সময় বৃদ্ধ হন না এবং তিনি তাঁর কর্ম থেকে অবসরও নেন না; দুনিয়ার বাদশাহর জন্মও আছে মৃত্যুও আছে, কিন্তু আল্লাহর জন্ম নেই মৃত্যুও নেই; দুনিয়ার বাদশাহর মাতা-পিতা আছে, ভাই-বোন আছে, ছেলে-পুলে থাকে, কিন্তু আল্লাহর মাতা-পিতা নেই, ভাই-বোন নেই, ছেলে-পুলে নেই, তিনি এসব সম্পর্ক থেকে পবিত্র; দুনিয়ার বাদশাহ মারা গেলে অন্য কেউ বাদশাহী গ্রহণ করে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন, কিন্তু আল্লাহ মারাও যান না এবং তাঁর বাদশাহী গ্রহণ করে কেউ দুনিয়ার শাসনকার্য পরিচালনাও করেন না ।

সুতরাং আল্লাহর সঙ্গ দুনিয়ার বাদশাহের তুলনা করা কি করে সম্ভব হতে পারে, আর আল্লাহর সাথে দুনিয়ার বাদশাহের তুলনা করা আমাদের দৃষ্টিতে কুফরী ছাড়া আর কিছুই নয় ।

অনেক সময় দেখা যায় বাদশাহ ভিখারীতে পরিণত হয়ে যান এবং প্রজাদের মধ্যেই কেউ না কেউ বাদশাহে পরিণত হয়ে যান । তখন প্রথম জীবনে যিন বাদশাহ হয়ে প্রজাদের মালিক সেজে বসে ছিলেন তখন সেই ভিখারী হয়ে যাওয়া বাদশাহ'ই নিজের প্রজাকে মালিক বলে মেনে নেন এবং তিনি যখন বাদশাহের কাছে যান তখন তাঁকেও কর্মচারীর সাহায্য নিতে হয় । তাহলে যে বাদশাহ ক্ষমতাই থাকাকালীন কর্মাচারীর মাধ্যমে প্রজাকে সাহায্য করেছিলেন সেই বাদশাহ'ই ক্ষমতা হারিয়ে বাদশাহর কাছে যেতে হলে কর্মাচারীর প্রয়োজন হয় কারণ তখন তাঁর সাম্রাজ্যে আর কোনো দাপট থাকে না ।

অপরদিকে আমরা দেখতে পাই, মহান আল্লাহপাক এমনই ক্ষমতাবান শাসক যে তাঁর সাম্রাজ্য হারিয়ে প্রজায় পরিণত হওয়ার কোন ভয় নেই, তিনি অনন্তকাল ধরে এই ব্রম্ভান্ডের উপর রাজত্ব করে আসছেন এবং অনন্তকাল ধরে এই ব্রম্ভান্ডের উপর রাজত্ব করতে থাকবেন ।

সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে দুনিয়ার বাদশাহের তুলনা করা মানেই মহান আল্লাহ পাকের জাতের সঙ্গে মারাত্মক ধরণের বেয়াদবী করা ছাড়া আর কিছুই নয় ।

একটি বিভ্রান্তিকর ফতোয়া

কবরপূজারীরা কবর পূজার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য বলে থাকেন, ‘‘সাতবার কোন ওলীর কবর জিয়ারত করলে একটি মকবুল হজ্বের সাওয়াব পাওয়া যায় ।’’

কবর পূজারীদের এই বিভ্রান্তিকর ফতোয়া শোনার পর অনেক মানুষ কেবলমত্র সাতবার ওলীর কবর জিয়ারত করে ক্ষান্ত হয়ে যান । হজ্ব ফরজ হওয়া সত্বেও তাঁরা সামান্য কষ্ট স্বীকার করে আর হজ্ব করতে যান না । কেবলমাত্র সাতবার ওলীর কবর জিয়ারত করে নির্ভয় হয়ে যান এবং হজ্বের মতো এক মহান আমল থেকে মাহরুম (বঞ্চিত) হয়ে যান । অথচ মহান আল্লাহ পাক কুরআনে করীমের মধ্যে এরশাদ করেছেন,

‘‘অ আযবিন ফিন্নাসি বিল হাজ্জি ইয়া’তুকা রিজাওলাও অ আ’লা কুল্লি দ্বারিমি ইয়া’তীনা মিন কুল্লি ফাজজিন আমীক ।’’

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে হজ্বের বিষয় ঘোষনা করে দাও যে তারা পদব্রজ বা সক্ষম উঁটের পিঠে আরোহন করে আসুক ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, ‘‘(সামর্থ থাকা সত্বেও) যে ব্যাক্তি হজ্ব না করে মারা যায় সে স্বেচ্ছায় ইহুদী বা খ্রীষ্টান হয়ে মারা যায় ।’’

হজ্ব সম্পর্কে নাবীজী (সাঃ) এর এই অমোঘ ঘোষনা থাকা সত্বেও কেবলমাত্র সাতবার ওলীদের কবর জিয়ারত করে যাঁরা নির্ভয় হয়ে যান তাঁর যে ইহুদী খ্রীষ্টান পর্যায়ের লোক তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয়না ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে সেবাযত্নকারী পুত্র পিতা - মাতার দিকে দয়া ও ভালোবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল (পরিপূর্ণ) হজ্বের সাওয়াব (পূণ্য) পাবে । লোকেরা আরজ করল, সে যদি দিনে একশতবার এভাবে দৃষ্টিপাত করে ? তিনি (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, একশতবার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সাওয়াব পেতে থাকবে । (বাইহাকী শরীফ)

এখন যদি কেউ বলেন, আরব সফর না করে, টাকা - পয়সা খরচ না করে, কষ্ট স্বীকার না করে হজ্বব্রত পালন না করে কেবলমাত্র মাতা - পিতার দিকে দয়া ও ভালোবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করলেই যখন একটি মকবুল হজ্বের সাওয়াব পাওয়া যাবে তাহলে হজ্ব করার প্রয়োজন কি ? তাহলে তাকে নীরেট হস্তিমূর্খ ছাড়া আর কি বলা যাবে ? এখানে নবীজী (সাঃ) বলেছেন, পিতা - মাতার দিকে দয়া ও ভালোবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করলে একটি মকবুল হজ্বের সাওয়াব পাওয়া যাবে কিন্তু যার জীবনে হজ্ব ফরজ হয়েছে তার ফরজ হজ্ব আদায় হবে না ।

ঠিক সেই রকম সাতবার কোন ওলীর কবর জিয়ারত করলে একটি মকবুল হজ্বের সাওয়াব পাওয়া যেতে পারে তবে যার জীবনে হজ্ব ফরজ হয়েছে তার ফরজ আদায় হবে না ।

সুতরাং কোন ওলীর কবর সাতবার জিয়ারত করে ফরজ হজ্ব আদায় হয়ে গেছে বলে যারা মনে করেন তাঁদেরকে নিতান্তই জ্ঞানপাপী ছাড়া আর কি বলা যাবে ?

বিদ্আতের বিরুদ্ধে একটি সুন্দর যুক্তি

অনেকে বলেন, কবর পাকা করা, মাযারে মানত করা, ওলীদের নামে জন্তু উৎসর্গ করা, কবরে সিজদাহ করা, কবরে ফুল - চাদর চাপানো, মাযারে গুম্বদ কোব্বা ইত্যাদি নির্মাণ করা প্রভৃতি কাজ কুরআন ও হাদীসে না থাকলেও করলে ক্ষতি কি ? বাহ্যিক দৃষ্টিতে এসব আমল সুন্দর বলেই ত মনে হয় । সুতরাং এসব কাজ করলে আল্লাহর কাছে সাওয়াব হবে না কেন ?

উত্তরে বলা যায়, মনে করুন কোন একজন ছাত্র এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে । সে যদি পরীক্ষা হলে প্রশ্ন পত্রে উল্লিখিত সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয় তাহলে সে ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করবে এবং পরীক্ষকের কাছেও সে ভালো ছাত্র হিসাবে গণ্য হবে । আর মনে করুন, সেই ছাত্র যদি ভালো উত্তর দেওয়ার পরেও এমন এমন প্রশ্নের উত্তর লিখল যা প্রশ্ন - পত্রে একেবারেই আসেনি । তাহলে সেই ছাত্র পাশ করলেও পরীক্ষকের নিকট ও অন্যান্য শিক্ষকের নিকটও ফালতু ছাত্র হিসাবে গণ্য হবে । কারণ, বাড়তি উত্তর লিখে নম্বরের আশা করা যায় না । আর মনে করুন সেই ছাত্র প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত একটি প্রশ্নেরও সঠিক উত্তর দিতে পারে নি, আর বাড়তি প্রশ্নপত্রে অনুল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর লিখে বাড়ি ফিরে আসে তাহলে কি সেই ছাত্রেক নম্বরও পাবে না জিরো (Zero) নম্বর পেরে ফেল মেরে বাড়ি ফিরবে ?

প্রত্যেক মানুষই এক বাক্যেই বলবেন ব্যাটা ফেল মেরে বাড়ি ফিরবে এবং 'হায় আফশোস ! হায় আফশোস !' মাথায় কষাঘাত করলেও কোন ফল লাভ হবে না ।

আর এরকম অপদার্থ ছাত্রের প্রতি পরীক্ষক ও শিক্ষক মহাশয় কোনদিন খুশি প্রকাশ করবেন না, বরং বলবেন, ব্যাটা খোদার উপর খোদ্দারি করতে গিয়েছে এবং বেশি করে পান্ডিত্য ফলাতে গিয়েছে । সে কিনা পরীক্ষক মহাশয়কে ফাঁকি দিয়ে নম্বর পেতে চায় ।

ঠিক সেই রকম আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সমগ্র মানব জাতিকে মাত্র দুটি প্রশ্নপত্র দিয়েছেন । এক নম্বর হল, কুরআন শরীফ ও দুই নম্বর হল হাদীস শরীফ । এই দুই প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর যদি কোন মানুষ দুনিয়া নামক পরীক্ষা হলে সঠিকভাবে দেয় অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে যা আল্লাহ ও তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, তা যদি নিঁখুতভাবে পালন এখলাস সহকারে পালন করে তাহলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিন ভাল নম্বর নিয়ে পাশ করে বেরিয়ে যাবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সম্মানীয় বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হবে । আল্লাহ এরকম বান্দাদের জান্নাত দান করবেন ।

আর যদি কোন মানুষ কুরআন ও হাদীসের মধ্যে যা আল্লাহ ও তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন তা পালন করার পর এমন কিছু আমল করল যা আল্লাহ ও তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেন নি তাহলে সে আল্লাহর দরবারে সম্মানীয় বন্দাদের অন্তর্ভূক্ত হবে না বরং সে বিদ্‌আতীদের অন্তর্ভূক্ত হবে ।

আর মনে করুন, কোন ব্যাক্তি যদি কুরআন ও হাদীস থেকে একটি আমলও এখলাস সহকারে পালন করল না যা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন, যেমন - নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, প্রভৃতি, আর এমন এমন রীতি বা প্রথা পালন করল যা আল্লাহ ও তাঁর নবী (সাঃ) বলে যান নি, যেমন - কবর পাকা করা, মাযারে মানত করা, ওলীদের নামে জন্তু উৎসর্গ করা, কবরে সিজদাহ করা, কবরে ফুল - চাদর চাপানো, মাযারে গুম্বদ কোব্বা ইত্যাদি নির্মাণ করা প্রভৃতি তাহলে সেই ব্যাক্তি আল্লাহর বিচারের দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এক নম্বরও পাবে না জিরো নম্বর পেয়ে ফেল মারবে ?

প্রত্যেক মানুষই এক বাক্যেই বলবেন, ব্যাটা ফেল মারবে এবং জিরো নম্বর পেয়ে অর্থাৎ কোন সাওয়াব বা পূণ্য না পেয়ে 'হায় আফশোস ! হায় আফশোস !'

বলে মাথায় কষাঘাত করলেও কোন ফল লাভ হবে না । আল্লাহ এরকম বান্দাদের দিয়ে জাহান্নামের খোরাক মেটাবেন ।

কুরআন ও হাদীসে কবর পাকা করা, মাযারে মানত করা, ওলীদের নামে জন্তু উৎসর্গ করা, কবরে সিজদাহ করা, কবরে ফুল-চাদর চাপানো, মাযারে গুম্বদ ইত্যাদি নির্মাণ করা ইত্যাদি কাজ আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী (সাঃ) বলে যান নি । যদি কোন মানুষ এর পরেও এসব কাজকে পূণ্যজনক বা সাওয়াবের কাজ মনে করে তাহলে তার মত হতভাগা, মূর্খ জাহিল লোক আর পৃথিবীতে হয়না । কারণ, যাতে সাওয়াব আছে তাই আমাদের রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) আমাদের জানিয়েছেন । তাবেয়ীন, তাবেতাবেয়ীন (রহঃ) আমাদের জানিয়েছেন । আর উপরিউক্ত কাজে যদি কোন সাওয়াব পাওয়া যেত তাহলে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের জানালেন না কেন ? সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) আমাদের জানালেন না কেন ? তাবেয়ীন, তাবেতাবেয়ীন (রহঃ) আমাদের জানালেন না কেন ?

এখানে কেউ যদি রাফেযীদের মতো বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শত্রুদের ভয়ে অনেক কিছু বলে যাননি তাহলে সে নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যাবে । আর যদি কেউ বলেন, ‘আল্লাহ ও তাঁর ওলীদেরকে কাশ্‌ফ ও এলহামের দ্বারা এসব কাজ মানুষকে করার হুকুম দিয়েছেন’ তাহলে তা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয় । কেননা কাশ্‌ফ ও এলহাম যদি শরীয়াত বিরোধী হয় তাহলে তা পালন করা মুসলমানদের জন্য আদৌ উচিৎ নয় বরং তা প্রত্যাখান করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য ওয়াজীব । আর উপরিউক্ত কাজ করা তো আল্লাহপাক কুরআনে ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন ।

আশা করি প্রত্যেক পাঠক আমার এ যুক্তি বুঝতে পেরেছেন আর মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করে নিয়েছেন যে আজ থেকে কবর পাকা করা, মাযারে মানত করা, ওলীদের নামে জন্তু উৎসর্গ করা, কবর সিজদাহ করা, কবরে ফুল - চাদর চাপানো, মাযারে গুম্বদ ইত্যাদি নির্মাণ করা প্রভৃতি বিদ্‌আত কাজ আর কোনদিন করবেন না । কিন্তু আমি জানি সাধারণ মুসলমান একথা বুঝলেও কবর পূজারীরা কোনদিন বুঝবে না । কারণ উপরিউক্ত বিদ্‌আত কাজ পরিত্যাগ করলে তো তাদের কবর পূজার লাভজনক ব্যাবসা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের পকেট গরম হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে ।

প্রবাদ আছে ঃ কুকুরের লেজ বারো বছর পোঁতা থাকলেও কোনদিন তা সোজা হয়না ।

বাপ-দাদার সংস্কৃতি না মূর্খতার পরিচয় ?

কবর পূজারীদের যখন কুরআন, হাদীস ও যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেওয়া হয় যে, কবর পাকা করা, মাযারে মানত করা, ওলীদের নামে জন্তু উৎসর্গ করা, কবর সিজদাহ করা, কবরে ফুল - চাদর চাপানো, মাযারে গুম্বদ ইত্যাদি নির্মাণ করা প্রভৃতি কাজ ইসলাম ধর্ম পরিপন্থী ও হারাম কাজ তখন তাঁরা যে উদ্ভট যুক্তির আশ্রয় নেন তা হল, ''আমরা বাপ-দাদা চৌদ্দ গুষ্টির আমল থেকে এইসব কাজ করে আসছি, সুতরাং আমরা এসব কাজ ছাড়তে পারব না, আমাদের পূর্বপুরুষরা কি ভূল পথে ছিলেন । আর এইসব কাজ যদি হারাম ও ইসলাম ধর্ম পরিপন্থীছ কাজ হত তাহলে তাঁরা এসব কাজ করতেন কেন ?''

এই কথা নিতান্তই অজ্ঞতা ও মূর্খতাপূর্ণ কথা । কারণ, যেসব কাজের প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না সেইসব কাজকে মানুষ যতই বরহক মনে করুক তা আমরা করতে পারি । আর সেসব কাজ বাপ-দাদা চোদ্দ পুরুষের আমল থেকে হয়ে আসুক আর না হয়ে আসুক ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একদল জাহান্নামীকে কিয়ামতের ময়দানে জিজ্ঞাসা করা হবে তারা জাহান্নামে কেন এসেছে ? তারা বলবে, আমরা বাপ-দাদার সংস্কৃতি আঁকড়ে ধারার কারণেই আজ জাহান্নামী হয়েছি । আমরা যদি বাপ-দাদার সংস্কৃতি আঁকড়ে না ধরতাম তাহলে জাহান্নামের অন্তর্ভূক্ত হতাম না ।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, কুরআন হাদীস পরিপন্থী যেসব কাজ আমাদের পূর্বপুরুষরা করে এসেছেন সেসব কাজকে অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরলেই আমাদেরকে উপরিউক্ত হাদীস অনুযায়ী জাহান্নামী হতে হবে ।

বর্ণিত আছে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর চাচা আবু তালেব যখন বিছানায় মুহুর্মূ অবস্থায় পড়েছিলেন, তখন নবীজী (সাঃ) তাঁর চাচা আবু তালেবকে বলেছিলেন, চাচা একবার বলুন 'লা ইলাহা ইল্লল্লাহ' তখন পাশ থেকে আবু জেহেল আবু তালেবকে বলেছিলেন, তুমি কি তোমার বাপ-দাদার সংস্কৃতি ছেড়ে দিয়ে মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করবে ? তখন আবু তালেব আবু জেহেলের কথা শুনে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ না করে শেষ পর্যন্ত বেইমান হয়ে মরেছিল ।

তাই যারা বলেন, আমরা বাপ-দাদার সংস্কৃতি ছাড়ব না, তাঁরা নিঃসন্দেহে আবু তালেব ও আবু জেহেলের দলের লোক আর তাঁদের যুক্তিও আবু জেহেলের অনুসৃত যুক্তি ।

আর বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যারা বলেন, আমরা বাপ-দাদার সংস্কৃতি ছাড়ব না, তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরাই বাপ-দাদা চোদ্দ পুরুষদের মধ্যে মদখোর, মাতাল, চরিত্রহীন । তাদের অনেকেরই বাপ-দাদা চোর-গুন্ডা, ডাকাত প্রভৃতি । আর তাঁরাই যদি বলেন, আমরা বাপ-দাদার সংস্কৃতি ছাড়ব না তাহলে আমার মনে হয় পৃথিবীতে কিয়ামত আসতে আর বেশী দেরী নেই ।

এখন যদি সমস্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভায়েরা বলেন, আমরা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পূজা করব এটা আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি । শিবলিঙ্গের পূজা করব এটা আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি, মা কালী, মা দূর্গা, চামুন্ডা, ধুর্জটির পূজা করব এটা আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি । যদি সমস্ত খ্রীষ্টান ভায়েরা বলেন, আমরা যীশু ও মা মরিয়মের উপাসনা করব কারণ এটা আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি, আমরা তিনজন ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করব কারণ এটা আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি । যদি কোন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভায়েরা মনে করেন আমরা গৌতম বুদ্ধকে জগতের সর্বময় কর্তা বলে মনে করব কারণ এটা আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি, জাতকের অলীক মনগড়া, কাল্পনিক, বানোয়াট কাহিনীগুলো আমরা বিশ্বাস করব কারন এগুলো আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি । যদি সমস্ত ইহুদী ধর্মাবলম্বী ভায়েরা বলেন, আমরা হযরত উযায়ের (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করব কারণ এটা আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি । আমরা ওল্ড টেষ্টামেন্টকে আল্লাহর বানী বলে স্বীকার করব কারণ এটা আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি । যদি সমস্ত জৈন ধর্মাবলম্বী ভায়েরা বলেন, আমরা ২৫ জন তীর্থঙ্করকে সঠিক পথপ্রাপ্ত বলে বিশ্বাস করব এবং মহাবীরের নীতি অবলম্বন করে চলব কারণ এটা আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি । যদি কোন পারসী ধর্মাবলম্বী ভায়েরা বলেন, আমরা জেন্দাবেস্তাকে ঈশ্বরের বাণী বলে স্বীকার করব এবং জরাথুষ্টের নীতিকে সঠিক বলে স্বীকার করব কারণ এটা আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি । যদি শিখ ধর্মাবলম্বী বলেন, আমরা গুরু নানকের নীতি অবলম্বন করে চলব এবং গ্রন্থ সাহেবকে সঠিক ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করব কারণ এটা আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি । যদি সাঁওতাল ধর্মাবলম্বী ভায়েরা বলেন, আমরা মারাংগুরুর নীতি অবলম্বন করে চলব কারণ এটা আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি । তাহলে আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে কেউই হেদায়ত প্রাপ্ত হবে না । কারণ তাঁরা নিজেদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি অন্ধভাবে ধরে রাখার জন্য পাগল । তাঁদেরও ঐ একই কথা আমাদের বাপ-দাদা চোদ্দ পুরুষেরা কি ভূল পথে ছিলেন ।

সব থেকে বড় কথা হল, এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার নবীর সাহাবী যদি বলতেন, আমরা কাবা শরীফে ৩৬০টি মূর্তির পূজা করব কারণ, এটা আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি, তাহলে আমার মনে হয় ইসলাম ধর্মকেই আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পেতাম না। তার থেকেও বড় কথা হল নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং যদি বলতেন, আমিও কাবা শরীফে অবস্থিত ৩৬০টি মূর্তির পূজা করব কারণ এটা আমাদের বাপ-দাদার সংস্কৃতি তাহলে ইসলাম ধর্মের নাম ও নিশানা খুঁজে পাওয়া যেত না।

সুতরাং সত্যতা যাঁচাই না করে বাপ-দাদার সংস্কৃতি অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে রাখা নিতান্তই অজ্ঞতা ও বুদ্ধিহীনতার পরিচয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

"মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়ারাদ্দু" অর্থাৎ 'যদি কোন লোক এমন কাজ করে, যে কাজ সম্পর্কে আমার তরফ থেকে কোররুপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুমতি নাই; সেই কাজ ও সেই কাজের কর্তা উভয়ই প্রত্যাখ্যাত ও মরদুদ। অর্থাৎ এমন লোকের অনুসরণ কস্মিনকালেও করা যাবে না' আর যেহেতু কবর পাকা করা, মাযারে মানত করা, ওলীদের নামে জন্তু উৎসর্গ করা, কবর সিজদাহ করা, কবরে ফুল - চাদর চাপানো, মাযারে গুম্বদ ইত্যাদি নির্মাণ করা নবী করীম (সাঃ) এর তরফ থেকে কোনরুপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুমতি নাই তাই যারা এসব কাজ করবে তারা নবী করীম (সাঃ) এর কথানুযায়ী প্রত্যাখ্যাত ও মরদুদ হতে বাধ্য। আর এমন লোকের অনুসরণ কস্মিনকালেও করা যাবে না।

হক পথে কারা আছে ?

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে - নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাইল গোত্রের লোকেরা বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া বাকি সবগুলি দল জাহান্নামে যাবে এবং আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে, একটি দল ছাড়া বাকি সবগুলি দল জাহান্নামে যাবে। তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসুল (সাঃ) কোন দলটি জান্নাতে যাবে ? তখন নবী করীম

(সাঃ) বললেন, আমি এবং আমার সাহাবারা যে পথে চলে সে পথে যারা চলবে তারাই জান্নাতী ।

আর অপরদিকে দেখা যায়, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জীবনে কোনদিন কবর পাকা করা, মাযারে মানত করা, ওলীদের নামে জন্তু উৎসর্গ করা, কবর সিজদাহ করা, কবরে ফুল - চাদর চাপানো, মাযারে গুম্বদ ইত্যাদি নির্মাণ করা প্রভৃতি কাজ করে যান নি তাই এইসব কাজ যারা করবে তারা বাহাত্তর দলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত, অর্থাৎ তারা জাহান্নামগামী দল, আর যারা এইসব কাজ করেন না তাঁরা নবীজী (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামদের দলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ জান্নাতী দল ।

সুতরাং উপরিউক্ত বিদ্আত কাজ যাঁরা করেন না তাঁরাই সাহাবায়ে কেরামদের পথের পথিক । নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার সাহাবীগণ উজ্বল নক্ষত্র সদৃশ । এদের ভিতর যাকেই অনুসরণ করবে, তুমি হেদায়াত প্রাপ্ত হবে ।"

তাই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যেহেতু কবর পূজারীদের মতো কোন ওলীর কবরে গিয়ে শির্ক - বিদ্আতের তান্ডবলীলা চালাননি তাই সেজন্য আমরাও কোন ওলীর কবরে গিয়ে শির্ক - বিদ্আতের তান্ডবলীলা চালাব না । আর যারাই কবর জিয়ারতের নাম করে ওলীদের কবরে গিয়ে শির্ক - বিদ্আতের তান্ডবলীলা চালাবে তারা যে বাতিল ফিরকার অন্তর্ভূক্ত একথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না । আর যাঁরা নবীজী (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দের মতো উপরিউক্ত বিদ্আত কাজ করেন না তাঁরাই খাঁটি 'সুন্নী' ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত বাকিরা সব সুন্নী নামধারী পাক্কা শয়তানের দল ।

আল্লাহর ওলীদের বিরোধীতা করা কুফরী

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছে, নবী করীম (সাঃ) হাদীসে কুদসী প্রসঙ্গে আল্লাহর এই কথা বলেছেন,

"যে লোক আমার 'ওলী'র সঙ্গে শত্রুতা করে, সে আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষনা দেয় । বান্দার উপর আমি যেসব ফরজ ধার্য করে দিয়েছি কেবল সেগুলো আদায় করেই আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে - এই এই আমার নিকট অধিক প্রিয় । নফল নামায পড়েও বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে । শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি । আর যখন কোন বান্দাকে ভালবাসতে শুরু করি

তখন আমি তার কান হয়ে যায় যা দ্বারা সে শুনে, সেই চোখ হয়ে যায় যা দ্বারা দেখে, সেই হাত হয়ে যায় যা দ্বারা সে ধরে, সেই পা হয়ে যায় যা দ্বারা সে চলে । অতএব সে আমার দ্বারাই শুনে, আমার দ্বারাই ধরে, আমার দ্বারাই চলে ।" (বুখারী শরীফ)

সুতরাং এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় আল্লাহর ওলীদের সঙ্গে শত্রুতা বা বিরোধীতা করা মানে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সমতুল্য । অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে - একদিন হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থণা করলেন । আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন - "হে মুসা ! বলত তুমি আমার জন্য কোন আমল করেছে ?"

হযরত মুসা (আঃ) বললেন - "হে প্রভূ ! আমি আপনার জন্য নামাজ পড়েছি, রোজা রেখেছি, আপনার গুনগান করেছি, দান - খয়রাত করেছি, তসবিহ তাহলিল করেছি, হজ্ব সম্পাদন করেছি, আপনার কালাম পাঠ করেছি এবং আপনার যিকর করেছি ।" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, "হে মুসা ! নামায তোমার ঈমানের চিহ্ন, রোজা তোমার জন্য ঢালস্বরুপ, দান - খয়রাত তোমাকে ছায়া দান করবে । তাসবীহ তাহলিলের বিনিময়ে বেহেশতে বৃক্ষ সৃষ্টি করা হবে, আমার কালাম পাঠের বিনিময়ে হুর লাভ এবং যিকরের বিনিময়ে তুমি নুরের জ্যাতি লাভ করবে । হে মুসা ! এসবই তো তোমার জন্য করেছ । বলো তো আমার জন্য কি করেছ ?" তখন মুসা (আঃ) আরয করলেন - "হে প্রভূ, আপনার জন্য কি করব বলুন ?" আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন - "হে মুসা ! তুমি কি কখনও আমার বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং আমার শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা করেছ ?" এতে হযরত মুসা (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহর জন্য ভালবাসা এ আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা করার মতো উৎকৃষ্ট আমল আর নেই । (দাকায়েকুল আখবার/মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী (রহঃ), পৃষ্ঠা-৬৯)

সুতরাং এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় আল্লাহর বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উৎকৃষ্ট আমলের মধ্যে অন্যতম আমল । আর আমরা জানি ওলীরা হলেন মহান আল্লাহ পাকের এক বিশিষ্ট বন্ধু । তাই তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা নেক আমলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ।

মহান আল্লাহ পাক কুরআনে করীমের মধ্যে বলেছেন,

"আলা ইন্না আওলিয়া আল্লাহি লা খাওফুন আলাইহিম্ ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানুনাল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন" অর্থাৎ 'জেনে রাখ, আল্লাহর 'ওলী' লোকদের কোন ভয় নেই, নেই তাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ । এরা সেই লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে ।' (সুরা - ইউনুস)

তাই সত্যিকারের যাঁরা মহান আল্লাহ পাকের ওলী তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা কোন মন্তব্য করতে পারিনা, করণ তাঁরা কঠোর সাধনার দ্বারা নিজেদের জীবনকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এবং এখনও দিচ্ছেন । আর যেহেতু তাঁরা ইসলামের জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেন মহান আল্লাহ পাকের ওলী হতে পেরেছেন তাই তাদের বিরোধীতা করা মানে দ্বীন - ইসলামের বিরোধীতা করার নামান্তর ।

অনেকে মনে করেন, যারা ওলীর কবরে গিয়ে ওলীদের নামে মানত করা, ওলীদের নামে জন্তু উৎসর্গ করা, ওলীদের কবরে সিজদাহ করা, ওলীদের কবরে ফুল - চাদর চাপানো, ওলীদের মাযারে গুম্বদ ইত্যাদি নির্মাণ করাকে জায়েয বলে মানেন না তাঁরা ওলী মানেন না । তাঁদের এ ধারণা যে কতটা বিভ্রান্তিপূর্ণ তা কুরআন হাদীস পাঠ করলেই বোঝা যায়, আর আল্লাহর ওলীদের মানতে হলে তাঁদের কবরে গিয়ে উপরিউক্ত কাজ করতে হবে তার কোন শর্তও শরীয়াতে নেই । ওলীদের জীবন বৃত্তান্ত পর্যাঠলোচনা করলে দেখা যায় তাঁরা কোনদিন অপর ওলীদের কবরে গিয়ে এইসব কাজ জীবনে কোনদিন করেন নি । বরং তাঁরা এইসব কাজকে শির্ক ও বিদ্আত মনে করেই সেইসব কাজকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । অনেকে বলেন, "গওস কা দামন নেহি ছোড়েঙ্গে, খাজা কা দামন নেহি ছোড়েঙ্গে" অর্থাৎ 'গওস পাক' অর্থাৎ বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ) এবং 'খাজা' অর্থাৎ খাজা মইনুদ্দিন চিশতী (রহঃ) জীবনে কোনদিন অপর কোন ওলীদের কবরে গিয়ে উপরিউক্ত একটি কাজও করেন নি । কারণ তাঁরা এইসব কাজ করাকে ইসলাম বিরোধী কাজ বলেই মনে করতেন । আর যেসব কাজ করাকে ওলীরা ইসলাম বিরোধী কাজ বলে মনে করতেন সেইসব কাজ ওলীদের কবরে গিয়ে করা কিভাবে বৈধতার সার্টিফিকেট প্রদান করা যেতে পারে ? কবর পূজারী ভায়েরা হটকারীতা না করে একটু মাথা ঠান্ডা করে চিন্তা করে দেখবেন । আর যে কাজ 'গওস পাক' ও 'খাজা বাবা' জীবনে কোনদিন করে যান নি সে কাজ করে কিভাবে তাঁদের 'দামন' ধরা যেতে পারে তা কবর পূজারী ভায়েরা সামান্য কষ্ট করে নিজেদের মগজে ঢোকাবার চেষ্টা করুন ।

আওলিয়ায়ে কেরামদের মাযহাব

হানাফী মাযহাব ঃ ইমাম বুখারীর উস্তাদ আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনে ময়ীন (রহঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ), শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ), শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ), শাহ আব্দুল কাদের দেহলবী (রহঃ), শাহ রফিউদ্দিন মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ), শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ), খাজা নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রহঃ), শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ), কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ), শায়খ আল মালেক গজদোয়ানী (রহঃ), হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ), মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ), মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ), শেখ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ), হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) প্রভৃতি ।

হাম্বলী মাযহাব ঃ বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ), আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) প্রভৃতি ।

মালিকি মাযহাব ঃ আল্লামা ইবনে আব্দুল বার মালিকি (রহঃ),

শাফেয়ী মাযহাব ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ), খাজা মইনুদ্দিন চিশতী (রহঃ), ইমাম গাজ্জালী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ), আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ), প্রভৃতি ।

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে । (অফ লাইন/অন লাইন)
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ? (অফ লাইন/ অন লাইন)
৩. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (অফ লাইন/অন লাইন)
৪. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ । (অফ লাইন)
৫. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ ।
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত
তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ) (অন লাইন/অফ লাইন)
৬. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের
অপবাদ ও তার খন্ডন । (অন লাইন)
৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় । (অন লাইন)
৮. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান । (অন লাইন)
৯. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ? (প্রকাশিতব্য)
১০. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ । (প্রকাশিতব্য)
১১. আমরা সবাই মৌলবাদী । (প্রকাশিতব্য)
১২. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা । (অন লাইন)
১৩. আমরা সবাই তালিবান । (প্রকাশিতব্য)
১৪. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ? (প্রকাশিতব্য)
১৫. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী । (প্রকাশিতব্য)
১৬. মাসআলা আমীন বিল জেহের । (অন লাইন)
১৭. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম ।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন । (প্রকাশিতব্য)
১৯. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত । (প্রকাশিতব্য)
২০. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক । (প্রকাশিতব্য)
২১. আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) (অন লাইন)
২২ বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অন লাইন)
২৩. আসুন সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে আমরা খতম করি । (অন লাইন)
২৪) আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য)
২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অন লাইন)
২৮) বেশ্যা নারীর আত্মকথা (তসলিমা নাসরিনের আত্মজীবনীর পোষ্ট মার্টম) (প্রকাশিতব্য)

অনুদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য । (প্রকাশিতব্য)

[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]

২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ । (প্রকাশিতব্য)

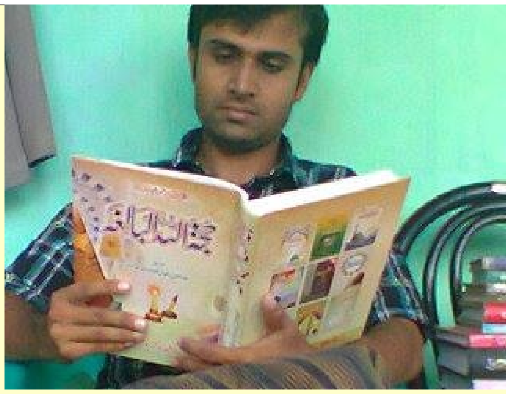
[মূল উর্দূ লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]

৩. হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ [মূল হিন্দি লেখক ড. এইচ. এ. শ্রীবাস্তব] (অন লাইন)

৪. কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দি লেখক ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] (অন লাইন)

পুস্তক সংগ্রহের ঠিকানা

(১) লেখকের বাড়ির ঠিকানায় ।
(২) ওসমানিয়া বুক ডিপো, কোর্ট মসজিদ গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9232609605
(৩) জিয়া বুক ষ্টোর, জিয়াউল মাদ্রাসা গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
(৪) লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ ।
(৫) বিদ্যার্থী, লোকপুর, হাটতলা, বীরভূম ।
(৬) বাড়াবন (ডাঙ্গালপাড়া) মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নুরুল আবসারের নিকট । মোবাইল - +91 9679897029
(৭) আমিল হাফিয ওবাইদুল্লাহ সাহেব, বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9734201012
(৮) মুহাম্মাদ অশিক ইকবাল (আবু ফাহিম), ময়ূরেশ্বর, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 7501879668
(৯) রাকিবুল ইসলাম খান, হরিনাজোল, বীরভূম ।
(১০) মাওলানা নজরুল হক সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
মোবাইল - +91 7501879668
(১১) বক্তা হযরত মাওলানা আজাদুর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক দারুল উলুম পাণ্ডুয়া, হুগলী, মোবাইল - +91 9593589225
(১২) বক্তা হযরত মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক ঘুড়িসা মাদ্রাসা, মোবাইল - +91 9734281395
(১৩) মাওলানা সাউদ আলম, শিক্ষক বাগোলবাটী, ইলামবাজার মাদ্রাসা,
মোবাইল - +91 9933473560
(১৪) মুফতি নজরুল ইসলাম, ইমাম শিউড়ি পুলিশ লাইন মসজিদ ও সম্পাদক বানাত মিশন, শিউড়ি, মোবাইল - +91 9733054943
(১৫) আব্দুল মান্নান, ইলামবাজার, বীরভূম,
মোবাইল - +91 9153120353
(১৬) বক্তা বদরুল আলম, শিক্ষক মাদ্রাসা জলিলিয়া, মুর্শিদাবাদ ।



লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জন্ম ঃ ১০ জানুয়ারী ১৯৮৮ । বীরভূম, শালজোড়, (পশ্চিমবঙ্গ)

শিক্ষা ঃ গ্রামের প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী/ ১৯৯২-১৯৯৭) । পরে লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (২০০৮) । এরপর দুমকার সিধু মানহু মুর্মু ইউনিভার্সিটি থেকে ভূগোলে অনার্সসহ গ্রাজুয়েশন । এরপর হরিয়ানার মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভর্সিটি থেকে বি. এড., (২০১২/২০১৩) ।

শখ ঃ ইসলামিক বিষয়বস্তু, বর্তমান পরিস্থিতি, বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা এবং ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মের উপর পড়াশুনা করা ।

Islamic Da'wah and Education Academy

Islamic Da'wah and Education Academy

Contact-
Ashik Iqubal
Mob- 7501879668
Ph. No-01776564817
email-
iqubal86@gmail.com
islamicdawahandedu@gmail.com
www.facebook.com/2014idea

Idea Publication

Preaching authentic Islamic Knowledge in the light of our pious-predecessors

Address- Mayureswar, Birbhum-731218, W.B., India

Islamic Da'wah and Education Academy